দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথাই বলেছিলেন নিবেদিতা
পৃঃ ১২

এক বিদেশিনী মহিলার ভারতীয় হয়ে ওঠার কাহিনি
পৃঃ ১৪

৭০ বর্ষ, ৯ সংখ্যা ।। ২৩ অক্টোবর ২০১৭ ।। ৫ কার্তিক - ১৪২৪ ।। যুগাব্দ ৫১১৯ ।। website : www.eswastika.com ।।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

Pradhan Mantri Awaas Yojana

মোট কেন্দ্রীয় অনুদান ১১,৩১৩.২৭ কোটি টাকা

বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ২৪ লক্ষ

বাড়ি তৈরি হয়েছে ১,৫৭, ১০৬

গৃহ প্রবেশ হয়েছে ১,২৭,৩৯৮

(৩১ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত) ।। সূত্র : এম ও এইচ ইউ এ

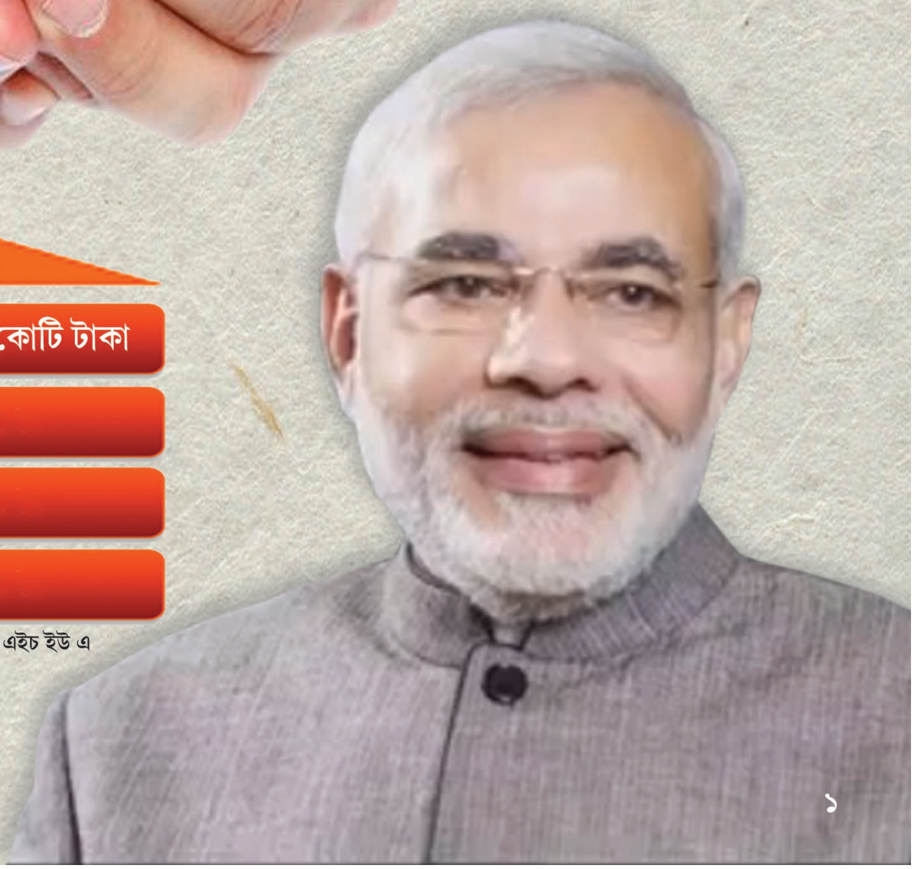

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ৫ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৩ অক্টোবর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

দমন-পীড়ন নয়, পাহাড়ের হৃদয় জয় করলেই শান্তি ফিরবে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : এক পুলিশের মৃত্যু ও দিদির চোখে... □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথাই বলেছিলেন নিবেদিতা □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

এক বিদেশিনী মহিলার ভারতীয় হয়ে ওঠার কাহিনি □ কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৪

ইসলাম : আরবের মরুভূমি থেকে সবুজ বাংলায় □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ১৭

সবার জন্য বাড়ি : মাথার ওপর ছাদ □ ১৯

সবার জন্য বাড়ি : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) □ ২১

লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করার কথা ভাবা দরকার □ এম থাম্বিদুরাই □ ২৭

গোপাষ্টমী এক পবিত্র অনুষ্ঠান □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত □ সলিল গেঁউলি □ ৩৩

তাপসী মামলায় কর্ণাটক হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় □ ধর্মানন্দ দেব □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ চিঠিপত্র : ২৯-৩০

□ অঙ্গনা : ৩৪ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ □ স্বজনবিয়োগ : ৩৮

□ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাহুলের বালখিল্যপনা

বর্তমানে আমাদের লোকসভায় সংবিধান স্বীকৃত কোনো বিরোধী দল নেই। কংগ্রেস দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হওয়ার সুবাদে রাহুল গান্ধীই এখন বিরোধী দলের নেতা। যদিও তাঁর কথাবার্তা বা ব্যবহার বিরোধী দলনেতার মতো মর্যাদাব্যঞ্জক তো নয়ই, বরং অনেক সময়েই বালখিল্যের মতো। এ নিয়েই এবার আলোচনা করেছেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জাতীয় নিরাপত্তায় রোহিঙ্গারা বিপজ্জনক

রোহিঙ্গা প্রশ্নটি লইয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলিতেছে। ভারতের কয়েকটি রাজ্য, যেমন পশ্চিমবঙ্গ এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল-সহ কয়েকটি সংগঠনও মানবিকতা রক্ষার খাতিরে রোহিঙ্গাদের (পড়ুন মুসলমানদের) শরণার্থী হিসাবে ভারতে আশ্রয় দিতে চাহিতেছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার স্বার্থে ভারতে রোহিঙ্গাদের প্রবেশের অনুমতি দিতে রাজি নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত দশ বছর ধরিয়া রোহিঙ্গারা ভারতে প্রবেশ করিয়া নিকটের রাজ্যগুলিতে না থাকিয়া সুদূর জম্মুতে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য ও প্রশ্রয়ে রোহিঙ্গাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রায় ৪০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসাবে এইসব শিবিরে রহিয়াছে। তাহাদের এই উপস্থিতি জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি উপত্যকায় অস্থিরতা সৃষ্টিতে মদত দিয়া চলিয়াছে। কয়েক বছর পর রোহিঙ্গারা যে জম্মুর জনসংখ্যার ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও বদল ঘটাইবে এবং পরিণামে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্ন চিহ্ন হইয়া উঠিবে—ইহা অভিজ্ঞতাই বলিয়া দেয়।

বাংলাদেশ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়া রোহিঙ্গারা যাহাতে ভারতে অনুপ্রবেশ করিতে না পারে এই জন্য বিএসএফ কড়া নজর রাখিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় লইয়াছে। সুযোগ পাইলেই যে তাহারা ভারতে প্রবেশ করিবে ইহা কোনও নূতন কথা নয়। ইতিমধ্যেই এক মুসলমান সংগঠনের নেতা কেন্দ্রীয় সরকারকে হুমকি দিয়াছে। ভারতে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় দিতে হইবে—ইহাই তাহাদের দাবি। বিএসএফ অবশ্য ইতিমধ্যেই পঞ্চাশটি স্থান চিহ্নিত করিয়াছে যেখান দিয়া সহজে রোহিঙ্গারা ভারতে অনুপ্রবেশ করিতে পারে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সীমা সুরক্ষাকর্মীদেরও (বিডিআর) রোহিঙ্গাদের উপর বিশেষ নজরদারি করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে। বিডিআর-এর এরিয়া কমান্ডার তরিকুল হকিম জানাইয়াছেন যে পুতখালি সীমান্তে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য সুযোগ খুঁজিতেছে। এই সীমান্তে শুধু একটা ছোট নদীই বাংলাদেশ ও মায়ানমার—এই দুই দেশের সীমারেখা নির্ধারণ করিতেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মিডিয়া-পরামর্শদাতা শোভন চৌধুরীও রোহিঙ্গাদের সঙ্গে জঙ্গি যোগাযোগের ঘটনা অস্বীকার করেন নাই। বাংলাদেশ কোনও গোষ্ঠীকেই তাহাদের দেশে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বরদাস্ত করিবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে আবার অনুপ্রবেশ ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কা অমূলক নয়। কেননা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এমন কিছু অঞ্চল আছে যেখান দিয়া গোরু পাচার ও জালনোটের চোরাচালান হইয়া থাকে। নিজের নিজের দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে যে সতর্কতা জারি করিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

সুভাষিতম্

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।। (গীতা ১৭/১৬)

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌমভাব, ভগবচ্চিন্তনের স্বভাব, মনের নিরোধ, অন্তঃকরণের পবিত্রতা—এগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।

শাসকদলের নির্লজ্জ তোষণনীতির জন্য ক্ষুব্ধ উত্তরবঙ্গের মানুষ

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজার মতো সম্প্রীতির উৎসবেও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও প্রশাসনের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের সাক্ষী থাকল উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা। গত ২৮ অক্টোবর মহাঅষ্টমীর দিন রাত্রি ৯ টায় কোচবিহার শহরে যখন আলোকোজ্জ্বল প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে, তখনই দেখা গেল পুলিশবেষ্টিত হয়ে কয়েকশো মুসলমান যুবক লাঠি, সড়কি, তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহরমের মিছিল বের করেছে। প্রশাসনের মদতে এই রকম তাজিয়া নিয়ে মিছিল দেখে প্রতিমা দর্শনার্থীরা হতচকিত হয়ে যান। হিন্দুদের উৎসবের দিনে কীভাবে পতাকা হাতে চিৎকার চেঁচামেচি করে এভাবে অস্ত্রশস্ত্র-সহ মিছিল করার অনুমতি পেল মুসলমানরা? কোচবিহার শহর জুড়ে এই রকম বেশ কয়েকটি মিছিলকে এদিনে প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে দাপাদাপি করতে দেখা গেল। এইভাবে শহরজুড়ে পূজার দিনে অস্ত্রহাতে মিছিল দেখে মহিলা ও শিশু দর্শনার্থীরা অনেকেই প্রতিমা না দেখে গণ্ডগোলের ভয়ে বাড়ি ফিরে যায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাস্তার মধ্যে থাকা ব্যারিকেটগুলিকেও পুলিশ মহরমের মিছিলের পথ সুগম করার জন্য তুলে নেয়। যদিও মুসলমানদের মহরম ছিল অষ্টমীর দু'দিন পরে। দশমীর দিন রাতে এবং তার পরের দিনও হিন্দুদের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। যদিও হাইকোর্টের নির্দেশে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তবুও এভাবে দুর্গাপূজার সময় তাজিয়া বের করার অনুমতি দিয়ে কোন ধর্মনিরপেক্ষতার নজির রাখা হলো?

এরকম নগ্ন মুসলমান তোষণ ও হিন্দুদের প্রতি প্রশাসনের অবজ্ঞার চিত্র ধরা পড়েছে মালদা জেলা সংশোধনাগারেও। সম্প্রতি সন্দেহের বশে কয়েকজন নির্দোষ ব্যক্তিকে পুলিশ চুরির দায়ে মালদা জেলহাজতে পাঠায়। তারা পাঁচ দিন পর হাজত থেকে ফিরে যে তিক্ত এবং গুরুতর অভিযোগ জানালেন তা শুনলে অবাক হতে হয়। প্রায় এক বছর ধরে মালদা জেলে সাজা খাটছেন কালিয়াচকের কুখ্যাত মাফিয়া বকুল শেখ ও ইয়াসিন শেখের দলবল। নতুন কয়েদিরা জেলখানায় ঢুকলেই তারা তাদের কাছে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে। না দিতে পারলে বিড়ির ছেঁকা প্রচণ্ড মারধর করে বাথরুমে ফেলে রাখে।

মোবাইলে বাড়িতে ফোন করে টাকা আদায় করছে। অর্থাৎ তারা সেখানে মোবাইল ব্যবহার করছে এবং গ্যাস নিয়ে নিজেদের মনের মতো রান্না করছে। আরও গুরুতর অভিযোগ, বকুল শেখের দলবল জেলের বাইরে থেকে গো-মাংস আনিয়ে হিন্দু কয়েদিদের সামনে রান্না করে খাচ্ছে। যদিও জেল সুপার দরজি ভুটিয়া সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

গত বছর মহরমের সময়ে মালদহ জেলার চাঁচলের কলিগ্রামে হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনা অনেকেরই মনে আছে। এই বছরও ওইরকম একই ঘটনা ঘটেছে। এবারে ঘটনাস্থল মালদা জেলার পুকুরিয়া থানার একবর্ণা, হরিপুর পূর্ব বেতাহা গ্রাম। দশমীর দিন গ্রামের রাস্তার ধারে একটি মাচায় অনেকের সঙ্গে ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ ফেকু মাঝি বসেছিলেন। সেই সময় প্রচণ্ড গতিতে আসা একটি মোটরবাইক ওই মাচাটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ফলে সবাই হুড়মুড় করে পড়ে যায়। মোটর বাইকের চালক এক মুসলমান যুবক। এ নিয়ে বচসা শুরু হতেই সেই মুসলমান যুবক ফোন করে মহরম দলের লোকজনকে ডাকে বেতাহা গ্রামে। ২ কিলোমিটার দূরের ঘুটাহা গ্রাম থেকে শ'দুয়েক যুবক লাঠি, বল্লম ও হাসুয়া হাতে বেতাহা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঢুকে হিন্দুদের মারতে থাকে, দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলতে থাকে— এই দুদিনে আমরা যা ইচ্ছে করতে পারি। হিন্দুদের কেটে মেরে ফেলে দিতে ও মহিলাদের ধর্ষণ করার হুমকি দেয়। রাজেশ মাঝি ও তার স্ত্রী পুতুল মাঝির গলায় হাসুয়া ধরে কেটে ফেলার হুমকি দেয়। সরস্বতী মাঝি, উষা মাঝি ও পুতুল মাঝিরা তাদের শিশুদের বাঁচাতে দুষ্কৃতীদের হাতে পায়ে ধরে।

এই ঘটনার পর বেতাহা গ্রামের বাসিন্দারা থানায় অভিযোগ করতে গেলে থানার বড়বাবু অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে মীমাংসার কথা বলেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল থমথমে পরিবেশ। মহিলারা সাংবাদিকদের কাছে সেদিনের মর্মস্পর্শী অত্যাচারের কথা বলেন। বেতাহা গ্রাম থেকে ১ কিলোমিটার দূরে হরিপুর বিনপাড়ার বাসিন্দারা জানান তারা সঠিক সময়ে এই ঘটনার কথা জানতে পারলে কার কতটা জোর রয়েছে দেখা যেত। হরিপুর বিনপাড়ার মানুষরা এই পূর্ব বেতাহা গ্রামের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের সাহস জোগাচ্ছেন। প্রসাসন যে মীমাংসার নামে দোষীদের কোনো প্রকার শাস্তি দেবে না— এটা তাঁদের অভিজ্ঞতা। তাঁদের অভিযোগ, মুসলমানরা শত অপরাধ করলেও ভোটব্যাঙ্কের জন্য তাদের সব অপরাধ মাফ করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দু'বছর আগে মহরমের মিছিল থেকে মাদিয়া গ্রামের এক পুলিশের এএসআই অনুপ মণ্ডলের বাড়ি ভাঙচুর করে এবং প্রায় তিন লক্ষ টাকার আসবাবপত্র পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত দোষীদের কোনও শাস্তি হয়নি, এমনকী একজন জেহাদিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।

আখড়া পরিষদের ভুল স্বীকার

‘নকল সাধু’র তালিকার অসীমানন্দ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত অসীমানন্দ নন

সংবাদদাতা॥ অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ ‘নকল সাধু’-দের ,তালিকায় স্বামী অসীমানন্দের নাম প্রকাশ করায় সারা দেশ জুড়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। পরে আখড়া তা সংশোধন করে জানায়, এই অসীমানন্দ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত নন। এই অসীমানন্দ অমরকণ্টকের এক ব্যক্তি, যে গৃহী ও তাঁর আচার-আচরণ ঠিক নয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে এক বৈঠকে আখড়া পরিষদ ১৪ জন তথাকথিত নকল সাধুর নামের তালিকায় স্বামী অসীমানন্দের নাম প্রকাশ করার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এদেশের জনজাতি সমাজে সনাতন-ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার ও সুরক্ষার জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত স্বামী অসীমানন্দের অবদান উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের ডাঙ্গ জেলার শবরীধামের কাছে তাঁর আশ্রম ছিল। তাই দেশের সংবাদমাধ্যম বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক প্রচার শুরু করে।

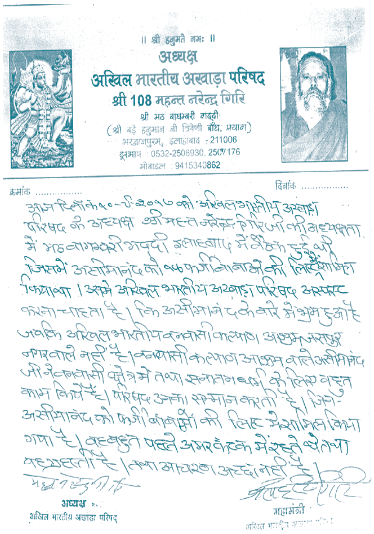
॥ श्री हनुमते नमः ॥
अध्यक्ष
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद
श्री 108 महन्त नरेन्द्र गिरि
श्री मठ बाघम्बरी गद्दी
(श्री बड़े हनुमान जी त्रिवेणी बाँध, प्रयाग)
भरद्वाजपुरम, इलाहाबाद - 211006
दूरभाष : 0532-2506930, 2507176
मोबाइल : 9415340862

क्रमांक .... दिनांक ....

आज दिनांक १०-९-२०१७ को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महन्त नरेन्द्र गिरि जी की अध्यक्षता में मठ बाघम्बरी गद्दी इलाहाबाद में बैठक हुई थी जिसमें असीमानंद को फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल किया था। उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद स्पष्ट करना चाहता है कि असीमानंद के बारे में भ्रम हुआ है जबकि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर नगर वाले नहीं है। वनवासी कल्याण आश्रम वाले असीमानंद जी ने वनवासी क्षेत्र में तथा सनातन धर्म के लिए बहुत काम किये हैं। परिषद उनका सम्मान करती है। जिन असीमानंद को फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है वह बहुत पहले अमरकंटक में रहते थे तथा वह गृहस्थ हैं। तथा आचरण अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद

महामंत्री
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद

আখড়া পরিষদের ভুল স্বীকারের প্রতিলিপি

এই পরিপ্রেক্ষিতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সর্বভারতীয় সভাপতি জগদেওরামজী আখড়া পরিষদের অধ্যক্ষকে একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠিতে রাম-রহিমের মতো লোকের সঙ্গে স্বামী অসীমানন্দের নাম যুক্ত করার জন্য প্রতিবাদ জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হরিদ্বারের ভারতমাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তথা ভানুপুরা পীঠের পূর্ব শংকরাচার্য স্বামী সত্যামিত্রানন্দজী এবং জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ মহারাজ তাঁদের চিঠিতে আখড়া পরিষদকে এই ভুল সংশোধন করতে বলেন। এর ফলে গত ৯ অক্টোবর হরিদ্বারে আখড়া পরিষদের অধ্যক্ষ স্বামী নরেন্দ্রগিরিজী এবং সম্পাদক স্বামী হরিগিরিজী এক ঘোষণার মাধ্যমে স্পষ্ট করেন যে ওই তালিকায় স্বামী অসীমানন্দের যে নাম রয়েছে তিনি বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের স্বামী অসীমানন্দ নন। যে অসীমানন্দের কথা বলা হয়েছে সে অমরকণ্টকের এক গৃহী ব্যক্তি, যে সাধু হিসেবে নিজেকে প্রচার করে।

তাজমহল হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন : ইতিহাস গবেষণা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দু যুগের কথা ভারতের ইতিহাসে বরাবরই উপেক্ষিত। সেই উপেক্ষিত অতীতকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পর্ষদ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরে রয়েছে তাজমহল নির্মাণে হিন্দু স্থাপত্যরীতির প্রমাণগুলি তুলে ধরা। পর্ষদের সদস্য-সচিব রজনীশ কুমার শুক্লা জানিয়েছেন আগামী মাসে তাঁরা ভারতের উপেক্ষিত অতীত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রজনীশ কুমার শুক্লা বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক দর্শন ও ধর্ম বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বর্তমানে ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পর্ষদের সদস্য ও সচিব। একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘তাজমহল তৈরিতে ব্যবহৃত পাথরের ইটে স্বস্তিক চিহ্নই প্রমাণ করে এটি হিন্দু স্থপতিদের নির্মাণ। অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রমাণ আজ অবধি কোনও ঐতিহাসিক তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করেননি।’ তাজমহলের সঙ্গে তিনি কাশ্মীরের উপেক্ষিত কারকোটা রাজবংশের উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, এই রাজবংশের অগ্রগণ্য সম্রাট ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ৩৪ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ পাওয়া যায় কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘আমাদের ঐতিহাসিকেরা আরবি ফারসি এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি থেকে তথ্য আহরণ করা সমীচীন মনে করেন। সংস্কৃত-সহ ভারতের অন্যান্য ভাষায় লিখিত আকর গ্রন্থগুলিতে যেসব তথ্যাদি রয়েছে তা উপেক্ষিতই থেকে যায়।’ তিনি মনে করিয়ে দেন ১৩ শ থেকে ১৯ শ শতক পর্যন্ত অসম শাসন করা অহম রাজবংশের কথাও কোনও ইতিহাস বইয়ে নেই। একই অবস্থা দক্ষিণের বিজয়নগর সাম্রাজ্যের। আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধীর ওপর স্বামী বিবেকানন্দের কতটা প্রভাব সে সম্পর্কেও ঐতিহাসিকেরা নীরব। ইতিহাসের এইসব হারানো যোগসূত্রই খুঁজে বের করবে পর্ষদ। তুলে ধরবে জনসমক্ষে।

অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বৈঠক

সঙ্ঘের লক্ষ্য গ্রামোন্নয়ন, পারিবারিক কাউন্সেলিং : ভাইয়াজী যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা দেশে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে, তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশের গ্রামগুলির অবস্থা আরও উন্নত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই প্রস্তাবে গ্রামে বসবাসকারী প্রতিটি পরিবারের কাউন্সেলিঙের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি ভূপালে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের ত্রিদিবসীয় বৈঠকের শেষে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী জানান, গ্রামের সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন, এবার থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার সমাধানের জন্য কাজ করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে সঙ্ঘের অখিলভারতীয় প্রচার প্রমুখ ড. মনমোহন বৈদ্য উপস্থিত ছিলেন।

ভারত মূলত একটি উন্নয়নশীল দেশ। ভারতের ৬০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। এদের পেশা সাধারণভাবে কৃষিকাজ, নয়তো কৃষিনির্ভর অন্যান্য কাজকর্ম। ভারতের গ্রামাঞ্চলে সঙ্ঘের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। বস্তুত সঙ্ঘের সর্বমোট শাখার দুই-তৃতীয়াংশই গ্রামে। সেই কারণে অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের সমাবেশে গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের সার্বিক উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়।

গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমরসতা সৃষ্টিতে অনেক সময় নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। ভাইয়াজী বলেন, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই তারা সচেতন হয়ে উঠবেন এবং সমরসতা সম্পন্ন সমাজ তৈরি হবে।

তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও গ্রামেগঞ্জে সঠিক তথ্য আদানপ্রদানে সমস্যা রয়েছে। তার জন্য গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত এবং সচেতন করে

তোলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এর পরেই ওঠে দেশের কৃষকদের সাম্প্রতিক সমস্যার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, গত কয়েকবছর ধরে দেশের কৃষকেরা নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। সঙ্ঘ মনে করে কৃষকদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রয়াস প্রয়োজন। সরকারকেও কৃষকদের অভাব-অভিযোগ ভালোভাবে বুঝতে হবে। অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের সমাবেশেও কৃষকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

এই প্রসঙ্গে ভাইয়াজী যোশী বলেন, কৃষকদের জৈবকৃষির ব্যাপারে আরও উৎসাহী করে তোলার জন্য সঙ্ঘ চেষ্টা করবে। সঙ্ঘ ইতিমধ্যেই জৈবকৃষি বিষয়ক কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, যা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক বলে প্রমাণিত। তবে কৃষি যে পদ্ধতিতেই হোক, কৃষককে তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার ব্যাপারে কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়। তিনি জানান, গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত এবং সচেতন করে তোলার কাজে সঙ্ঘ ৩০-৩৫ বছর বয়েসী স্বয়ংসেবকদের ওপর জোর দেবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাছে সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিবার। ভাইয়াজী যোশী বলেন, পরিবার ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিত। একজন ব্যক্তি তার জীবন গড়ে তোলেন পারিবারিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষাকে পুঁজি করে। আজকাল ভারতীয় পরিবারগুলি হয়ে উঠেছে ভোগবাদ এবং আত্মসুখবাদের অসহায় শিকার। পরিবারগুলির ওপর নেমে আসা এই আক্রমণ ঠেকাতে সঙ্ঘ বদ্ধপরিকর। তার জন্য পরিবার প্রবোধন নামে নতুন এক বিভাগ শুরু করা হয়েছে।

ভাইয়াজী যোশী মনে করিয়ে দেন, ভারতীয় পরিবার তার সদস্যদের মনে জীবনবোধ সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে সাহায্য করে। জাতিগঠনেও পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জনজাগরণের দিক থেকে বিচার করলে পরিবারগুলি ধাত্রীর কাজ করে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা পরিবারগুলির শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। সমাজের একেবারে তৃণমূলস্তরের প্রতিটি মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার বিকাশে এই প্রয়াস যথেষ্ট ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে তিনি জানান।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ বলেন, সঙ্ঘ ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ পরিবার এবং ১ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্ঘ মনে করে, সমাজে সার্থক এবং সদর্থক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে পরিবার প্রবোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব শেষে তিনি জানান, অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের সমাবেশে যেসব বিষয় আলোচিত হলো আগামী বছরে অনুষ্ঠিতব্য প্রতিনিধি সভায় তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

জনধন যোজনা

গ্রামের মানুষের মদ্যপানে রাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গ্রামের যেসব মানুষ প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন তাদের মদ্যপান এবং তামাকজাত দ্রব্যের নেশা আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে। সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার আর্থিক গবেষণা শাখার একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। সেই সঙ্গে এও জানা গেছে মুদ্রাস্ফীতির গতিতে রাশ টানতেও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে জনধন যোজনা। গোড়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন জনধন অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেনের ফলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। কিন্তু গ্রামের খুচরো বাজারে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ করে সমীক্ষকেরা জানিয়েছেন, যেসব রাজ্যের মোট জনধন অ্যাকাউন্টের ৫০ শতাংশ গ্রামের মানুষের নামে নথিভুক্ত, সেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের মোট জনধন অ্যাকাউন্টের ৭৫ শতাংশ (২৩ কোটি) রয়েছে দশটি রাজ্যে। এই তালিকায় প্রথমেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৪.৭ কোটি)। দ্বিতীয় বিহার (৩.২ কোটি) এবং তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ (২.৯ কোটি)।

উবাচ

"শব্দবাজি নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্যের প্রয়োজন, পরে কারও প্রদীপ নিয়েও সমস্যা হতে পারে।"

শব্দবাজি নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে

ভাইয়াজী যোশী
সরকার্যবাহ, আর এস এস

"হিন্দুত্ব কোনও ভোটব্যাঙ্ক নয়, এক সংস্কৃতি, এ দেশের আত্মা।"

গুজরাটে বিজেপির গৌরবযাত্রা প্রসঙ্গে

যোগী আদিত্যনাথ
মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ

"চীন এখন ভালোভাবেই বুঝেছে যে ভারত আর দুর্বল নয়।"

লক্ষ্ণৌতে এক সভায়

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

"যারা ভারতের জাতীয় পরিচয় ধ্বংস করতে চেয়েছিল তাদের ইতিহাস যত মুছে যায় ততই মঙ্গল।"

তাজমহলের ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রসঙ্গে

সঙ্গীত সোম
উ:প্র: সারধানার বিজেপি বিধায়ক

"আমাদের কাছে এই নির্বাচন বিকাশবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধ। কিন্তু বিরোধীদের কাছে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার। আমি নিশ্চিত যুদ্ধে বিকাশবাদই জয়ী হবে।"

গুজরাটের আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"পরবর্তী দীপাবলীতেই ভক্তরা হয়তো অযোধ্যায় রামমন্দির দেখতে পাবেন। নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু করতে চাই আমরা।"

বিরাট হিন্দুস্থান সঙ্গম আয়োজিত সেমিনারে

সুব্রহ্মণ্যম স্বামী
বিজেপি সাংসদ

দমনপীড়ন নয়, পাহাড়ের হৃদয় জয় করলেই শান্তি ফিরবে

গূঢ় পুরুষের কলম

মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা তরুণ পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিক দার্জিলিং পাহাড়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের সকলকেই শোকাহত করেছে। এই অকাল মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ, মৃত্যু হয়েছে পুলিশ এর বড় কর্তাদের গাফিলতিতে। দার্জিলিংয়ের পুলিশ কর্তারা আক্ষরিক অর্থে দিদির দলদাস। দিদি বলে দিয়েছেন, যে-কোনও মূল্যে বিমল গুরুংকে ধরতে হবে। তাই আক্রান্ত হতে পারেন জানা সত্ত্বেও মান্ধাতার আমলের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে সাব ইন্সপেক্টার অমিতাভকে পাঠানো হয় দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে। অবাক লাগে, যখন দেখি পুলিশ ট্রেনিং ম্যানুয়ালকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে বড় কর্তারা অধঃস্থন কর্মীদের অরক্ষিতভাবে একে ৪৭-এর মতো আধুনিক শক্তিশালী রাইফেলধারী দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করতে পাঠান। কাশ্মীর এবং ছত্তিশগড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধরতে যখন পুলিশবাহিনী যায় তখন তাঁদের হাতে থাকে সর্বাধুনিক অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম। শুধু লাঠি আর হয় না। প্রয়াত অমিতাভ মালিকের দুর্ভাগ্য যে তাঁর সুরক্ষার সামান্যতম ব্যবস্থা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ করেনি। কেন? বিমল গুরুংকে ধরতে যাওয়ার জন্য পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে কোনো সিনিয়ার আই পি এস অফিসার ছিলেন না কেন? জবাব চাই। কিন্তু জবাব দেবে কে?

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে গোয়েন্দা পুলিশ জানতো না যে দার্জিলিং শহরের কাছেই লেপচা বস্তিতে গত একমাস ধরে মোর্চার গুরুংপন্থী সশস্ত্রবাহিনী গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেলের আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ চলছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জানা না থাকায় অমিতাভ মালিকের নেতৃত্বে যাওয়া পুলিশবাহিনী স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিবৃষ্টির মধ্যে পড়ে। ভোর রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে অবিরাম গুলি বর্ষণের উৎসটি বুঝতে পারেনি পুলিশ। আত্মরক্ষার জন্য লেপচা বস্তির বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চেয়েও তা পায়নি পুলিশ। নবান্নের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে দিদি যতই বলুন না কেন যে বিমল গুরুংকে পাহাড়ের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। বাস্তব যে তা নয় লেপচা বস্তির বাসিন্দারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে দার্জিলিং পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে চেয়েছিল সিপিএম। সফল হয়নি। মমতাও সেই ব্যর্থ পথেই চলেছেন। বিনয় তামাংকে শিখণ্ডী খাড়া করে বিমল গুরুংদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। এর জন্য চাই জনসংযোগ। পাহাড়বাসীর মন জয় করতে হবে। ছলে বলে কৌশলে জিটিএ দখল করে নবান্ন থেকে পাহাড় শাসন করার যে ব্যবস্থা এখন চলছে তা বাতিল করতে হবে। কারণ, পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে গেলে একশো শতাংশ প্রশাসনিক ক্ষমতা স্থানীয় মানুষজনকে দিতে হবে। নবান্ন থেকে হুমকি দিয়ে পাহাড়ে শান্তি ফিরবে না। ফিরতে পারে না।

দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার অখিলেশ চতুর্বেদীর বয়ান অনুসারে, গুরুংয়ের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে তাকে ধরতে সদর থানার পুলিশ লেপচা বস্তিতে যায় এবং বিপদে পড়ে। এটা যে একটা ফাঁদ তা বুঝতে পারেনি পুলিশ। বোঝা যাচ্ছে যে গুরুংবাহিনী আগে থেকেই জানতো যে পুলিশদল ঠিক কখন লেপচা বস্তিতে পৌঁছবে। তারা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। পুলিশ পৌঁছনোমাত্রই স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলি চালাতে শুরু করে দেয় গুরুংবাহিনী। এত দ্রুত আক্রমণ চলে যে আগাম প্রস্তুতি না থাকলে তা সম্ভব নয়। দার্জিলিং পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে যে গুরুংপন্থীরা আছে তা এখন স্পষ্ট। তাই সরষের ভিতরে থাকা ভূতদের প্রশাসন থেকে সবার আগে সরাতে হবে। অন্য আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে, রাজ্য পুলিশের আধুনিক অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং নেই। মোদী সরকার দার্জিলিং পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে যথেষ্ট কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে। মমতা প্রশাসন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্রেফ বসিয়ে রেখেছে। লেপচা বস্তিতে অভিযান চালাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়নি কেন তার জবাবও দিতে হবে নবান্নকে। মনে রাখতে হবে, রাজ্য বিজেপি নেতাদের গুণ্ডা দিয়ে পেটালেই পাহাড়ে শান্তি ফিরবে না। বিজেপি নেতৃত্ব বাংলা ভাগ করে গোর্খাল্যান্ড গড়ার সমর্থক নয়। একই সঙ্গে শাসকদলের নেত্রী মমতার পাহাড়বাসীকে ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার নীতিরও বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন যে বিমল গুরুংকে গারদে পুরলেই পাহাড়ে শান্তি ফিরবে। মোটেই তা হবে না। দমন পীড়নের নীতি অনুসরণ করলে একজন বিমল গুরুংয়ের বদলে দশজন বিমল গুরুং জন্মাবে। ■

এক পুলিশের মৃত্যু ও দিদির চোখে...

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

দীর্ঘ পূজাবকাশের পরে চিঠি লিখতে বসে বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণের সুযোগ পেলাম না। আসলে একটা মৃত্যু বড় শোকাহত করেছে। পুলিশের চাকরি ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সেই ঝুঁকিটা যখন তৈরি করা হয় তখনই প্রশ্ন তৈরি হয়। মনে হয় নানা কিছু। তাই আপনাদের প্রতি সুন্দর মৌলিকের চিঠি এখানেই শেষ। বরং এমন একজনকে চিঠিটা লিখি বরং যে পড়তেই পারবে না।

প্রয়াত অমিতাভ,

না, আপনার নামে শহিদ বেদি হবে না। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে কেউ ট্যুরিস্টদের বলবে না— এই দেখ এই জায়গাটায় একদিন ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। প্রাণ দিয়েছিল এক বাঙালি বীর। ১৪ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখটাও লাল কালিতে লেখা হবে না। বিউটি মালিক নামের সদ্যবিবাহিতা মেয়েটি ছাড়া, অমিতাভর বাড়ির মানুষ ছাড়া আর কেউ মনে রাখবেন না আপনাকে। সংবাদমাধ্যম সক্রিয় হবে, উত্তর সম্পাদকীয়তে। বিমল গুরুং নামক গণশত্রুর বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে মিডিয়া। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে না এই 'এনিমি অব দ্য পিপল'-কে কোন কোন সিস্টেম তৈরি করেছে? যে-কোনও রাজনৈতিক দল যে-কোনও অ্যাঙ্গেল থেকে ফায়দা নেবে। কিন্তু গুরুংরা থাকবেন।

আপনি তবু শোকটুকু পেলেন। তরুণ সাব ইন্সপেক্টর অমিতাভ মালিকের মৃত্যুতে শোকাহত গোটা রাজ্য। ২৬ বছরের এক ঝকঝকে প্রাণের এমন করুণ পরিণতি মানতে পারছেন না কেউই। ব্যাঙ্কের মোটা বেতনের নিশ্চিন্ত চাকরি ছেড়েও ঝুঁকিপূর্ণ পুলিশের চাকরিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি উঠছে প্রশ্নও। আরও একটু সতর্ক প্ল্যান কি করা যেত না? কেনই বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসারের পরিবর্তে তাঁকে নেতৃত্বে পাঠানো হলো?

ফেসবুকে নিজের টাইমলাইনে এমনই সব প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ডেপুটি সুপারিটেন্ডেন্ট অব পুলিশ সুব্রত বসু। তিনি তাঁর পোস্টে লিখেছেন— তিন বছর মেয়াদ কালের একজন সাব ইনস্পেক্টর যাঁকে দু' বছরের প্রশিক্ষণ পর্ব পার করতে হয়, তাঁর নেতৃত্বে কেন এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান হলো? যে ডিএসপির কথা বলা হয়েছে কেন তিনি দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলয়ে অবস্থান করলেন? নাকি ঘটনা শোনার পর রওনা দিয়েছিলেন? ঘটনা সম্পর্কিত আগাম খবর নিশ্চয়ই ছিল। জেলার পুলিশ সুপার বা অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার এই অভিযান সম্পর্কে কি অবগত ছিলেন না? তাঁরাই বা কীভাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসারের বদলে একজন আনকোরা সাব ইন্সপেক্টরকে এই ধরনের অভিযানে নেতৃত্ব দেবার সপক্ষে মত দিলেন? নাকি এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?

রাজ্য সরকারের কাছে পাহাড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কি একটা উর্দি পরিহিত লাশ দরকার ছিল! একজনকে যূপকাষ্ঠে বলি না দিলে বিমল গুরুংয়ের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যত সহজে বিমল গুরুংয়ের উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে, তত সহজে কি আদালতে সেটা প্রমাণ করা যাবে?

আজ বিমল গুরুংকে ধরার জন্যে যে তৎপরতা, মদন তামাং খুনের পর তা দেখা গেল না কেন? তখন কি সে সরকারের বন্ধু ছিল? এত অস্ত্র তো একদিনে জমা হয়নি! এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর উদ্ধারকৃত অস্ত্র সাজিয়ে ঊর্ধ্বতন অফিসাররা কোন লজ্জায় ছবি তোলেন?

সরকার তো ক্ষতিপূরণ আর চাকরি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে। বিষমদ খেয়ে মারা গেলেও যা হয়ে থাকে। খেলার মাঠে পুলিশের হেলমেট, লাঠি নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইটবৃষ্টি হলে হয় সে পালাবে, না হয় বেঘোরে প্রাণ দেবে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, তাঁদের ঠাণ্ডা ঘরে নেওয়া স্ট্র্যাটেজি কার্যকর করতে গিয়ে আর কত পুলিশ প্রাণ দেবে? বীরভূম, গার্ডেনরিচ, দার্জিলিং—তার পর?

এই চিঠি, এই প্রশ্ন আপনি পড়তে পারবেন না। কিন্তু, এই প্রশ্ন গুলোর কোনও উত্তর কি মিলবে? মিলবে না।

—সুন্দর মৌলিক

হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথাই বলেছিলেন নিবেদিতা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

‘এখন ভারতবর্ষকে জাতীয়তা শব্দটিকে তার সর্বাধিক ব্যাপকতা ও তাৎপর্যসহ ধরিয়ে দেওয়াই মূল কাজ। বাকি কাজ আপনা থেকেই হয়ে যাবে। ভারতবর্ষকে এই বিরাট বোধের আলোকে অবশ্যই দর্শন করতে হবে। ...আমার লাঙলের ফলা ভারতের উপর দিয়ে কেটে এগিয়ে যাক---গভীরে, আরো গভীরে— চলার সময়ে ঢুকে যাক একেবারে কেন্দ্রে।... জাতীয়তার ধারণ হবে উঠবে ভারতের খড়্গ।’ এই কথাগুলি বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর স্বামীজীর জাতীয়তাবোধে দেশের তরুণ এবং যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে যখন ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন নিবেদিতা, তখন বিভিন্ন রচনায় তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। এই বছরটি নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ। ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের ছোট্ট শহর ডনগ্যাননে জন্মেছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতবর্ষে এসে হয়েছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজী এই বিদেশি পুষ্পটিকে নিবেদন করেছিলেন ভারতমাতার চরণে। মিশনারি পিতা-মাতার সন্তান নিবেদিতা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বেছে নিয়েছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর জীবন, হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। আজ, স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে যখন নতুন করে এদেশে আবার জাতীয়তাবাদের চর্চার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে, যখন এ সত্য উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, একমাত্র জাতীয়তাবাদী ভাবনাই ভারতকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে, তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিবেদিতা কী ভেবেছিলেন, কী বলেছিলেন— তার চর্চাও আবশ্যিক বই কী। নিবেদিতাকে একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ।

সেকথা নিবেদিতা নিজেই স্বীকার করেছেন। ১৮৯৮ সালে নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে স্বামীজী তাঁকে ভারতবর্ষকে চিনিয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন। নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন, স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন— ‘এই ভ্রমণে চলো— তুমি এক আছো— তোমাকে বিশ করে দেব।’

স্বামীজী নিবেদিতার এই ভারত পরিভ্রমণের সঙ্গে কোথায় যেন রামায়ণের আদি কাণ্ডে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্রের অরণ্যযাত্রার সাদৃশ্য রয়েছে। ওই যাত্রাপথে বিশ্বামিত্র এই বিশাল পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রামচন্দ্রের। তেমনই, নিবেদিতার লেখাতেও দেখি স্বামীজী নিবেদিতাকে চিনিয়ে দিচ্ছেন প্রকৃত ভারত কোনটি। নিবেদিতা লিখেছেন— ‘‘যে সকল মহানগরী সৌন্দর্যে স্বীকৃতি ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, শুধু তাহাদের বিষয় যে স্বামীজী আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা নহে। আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেতখামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তাঁহার তন্ময়ভার যেরূপ প্রগাঢ় হইত, এমন আর বোধহয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন।’’ ঋষি বিশ্বামিত্রর সাহচর্যে ভারত দর্শনের ফলস্বরূপ রামচন্দ্র একসময় বলেছিলেন— ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী।’ তেমনই স্বামীজীর সঙ্গে ভারত পরিভ্রমণের ফলস্বরূপ নিবেদিতা একসময় বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন— ‘একে শুধু মানচিত্র ভাববে না। মনে রাখবে এ তোমাদের জননী। জননী ভারতবর্ষ। যেখানে যাবে, সব সময় এই মায়ের কথাই চিন্তা করবে। এই মায়ের সুখই তোমার সুখ। এ মায়ের দুঃখ তোমারও দুঃখ। বন্দে মাতরম্।’

নিবেদিতাকে এই যে জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বামীজী— যে জাতীয়তাবাদী ভাবনার স্বরূপটি কী রকম? সে কি পাশ্চাত্য ভাবনায় জারিত জাতীয়তাবাদী চিন্তা? নাকি সনাতন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর আস্থাশীল জাতীয়তাবাদী ভাবনা? সেটি বুঝতে হলে আগে দেখা দরকার— ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে স্বামীজী কী বুঝিয়েছিলেন। স্বামীজীর বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতার অংশবিশেষগুলি যদি বিচার করা যায়, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হয় না— সনাতন হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতিকে স্বামীজী ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ মনে করবেন। এবং যে কারণেই হিন্দুত্বকে বাদ দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা কখনই চিন্তা করেননি স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী বলেছেন— ‘এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে; কিন্তু নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে।’ অন্যত্র বলছেন— ‘ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া— সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।’ বলেছেন, ‘ভারতীয় জাতি নষ্ট হইবার নহে। মৃত্যুকে উপহাস করিয়া ভারতবাসী নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে এবং যতদিন ভারতের জাতীয় ভিত্তিস্বরূপ ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যতদিন ভারতের লোক ধর্মকে ছাড়িয়া বিষয়সুখে

উন্মত্ত না হইবে, যতদিন ভারতবাসীরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহারা এইরূপই থাকিবে।' এবং হিন্দুত্বকে বাদ দিয়ে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কল্পনা করা সম্ভব নয় সেকথা বুঝেই স্বামীজী বলেছিলেন— 'এখন ধর্ম ও হিন্দু— এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়েছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই।...অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।'

ফলে, নিবেদিতাও যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন, তখন সেই জাতীয়তা হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই— এটি বরাবর স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে নিবেদিতার লেখা গ্রন্থগুলির উদাহরণ দেওয়া যেতেই পারে। যেমন 'ক্রেডেল টেলস অব হিন্দুইজম।' নিবেদিতার এই গ্রন্থটি মিশনারিদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছে। এই গ্রন্থটির প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন— 'পুরাণে এমন শত শত কাহিনি রয়েছে, যা হিন্দুদের মধ্যে উৎসাহী ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জানা নেই। কিন্তু এই কাহিনিগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ভালো করে দেখলে এর মধ্যে ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।' লক্ষণীয় যে, হালের বামপন্থী এবং সেকুলার ইতিহাসবিদদের মতো নিবেদিতা হিন্দু পুরাণকে নস্যাৎ করেননি। বরং, তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এর ভিতর ঐতিহাসিক সূত্রে খুঁজে পেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভারত মঞ্চে বলেছিলেন, 'তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।' আর নিবেদিতা সীতাদেবীকে জাতির জননী আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, 'সীতা চরিত্রটি মা মেরীর মতোই মহিয়সী।'

এই হিন্দুত্ববোধে উৎসারিত হয়েই নিবেদিতা লিখেছিলেন তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'কালী দ্য মাদার।' এই গ্রন্থটি পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ মনে করতেন, 'এই গ্রন্থটি নিতান্তই অহিংস নয়।' শুধু অরবিন্দ কেন, সেই সময়ে বিপ্লবীদের অনেককেই আলোড়িত করেছিল এই গ্রন্থটি। বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণাস্বরূপ এই গ্রন্থে নিবেদিতা কালী রূপের ভিতর দিয়েই বিপ্লবের সুগভীর বার্তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থেই নিবেদিতা লিখছেন— 'ওঠ বৎস, জাগো। বেরিয়ে পড় বীরের মতো। বহন কর দায় পুরুষের মতো। করণীয় কাজ সমাধা কর পূর্ণ শক্তিতে, নির্ভয়ে। ভুলো না— আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে— আমি তোমার মতো।'

আরও লিখেছেন— 'যারা আমার— তাদের হৃদয়ে ঝলসায় কালীর বলিদানের খড্গ। মাতার খড্গ— অবতারের তারা জন্ম উপাসক। তারা মৃত্যুপ্রেমিক— জীবনশুদ্ধ নয়। তারা ভালোবাসে ঝড়-ঝঞ্ঝা, দ্বন্দ্ব সংঘাত। তারা আসবে তোমার কাছে না-জ্বালা মশাল নিয়ে— আগুনের জন্য। উপচীয়মান পৃথিবীর উপর দিয়ে আমার কণ্ঠ ডাক দিয়ে ফিরছে জীবনের জন্য— নরপতিগণের প্রাণ ও রক্তের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে। মনে রেখো, যে আমি চিৎকার করে ডাকছি, সেই ডাকে উত্তর কী করে দিতে হয় তাও দেখিয়ে দিয়েছি। এইটুকু জেনো, সর্বক্ষেত্রে মা-ই সর্বপ্রথম মৃত্যুতে ঝাঁপ দেন তার শাবকদের রক্ষার জন্য।'

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও এই হিন্দু ভাবনাকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। কেমনভাবে? এ প্রসঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণা উল্লেখ করা যেতেই পারে। ১৯০৩ সালে ৮-১১ অক্টোবর নিবেদিতা নাগপুরে অবস্থান করেছিলেন। ওই সময়ে দুর্গাপূজা পড়েছিল। ওই সময়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী জিভি দেশমুখ লিখেছেন— 'দশেরার দিন দেবী দুর্গার সামনে অস্ত্রপূজা করা ভারতীয় রীতি। নিবেদিতা অবাক হয়েছিলেন এই ভেবে যে কী করে আমরা দেবী দুর্গা এবং তাঁর অস্ত্রকে ভুলে গেলাম। কী করে ভুলে গেলাম দেবী দুর্গার বার্তাকে। নিবেদিতা বললেন, 'ভোঁসলা রাজাদের রাজধানীতে এই দশেরার দিন তিনি মারাঠাদের বীরত্ব দেখতে চান। সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের তিনি এ বিষয়ে জোর দিতে থাকেন। কিন্তু এই কথা শুনে সভায় উপস্থিত দশেরার দিন তরোয়াল খেলা, কুস্তি এবং নানা শারীরিক কসরত দেখতে চাইলেন নিবেদিতা।' আজ যাঁরা অস্ত্রপূজনের বিরোধিতা করতে চাইছেন— তাঁরা কী ব্যাখ্যা করবেন নিবেদিতার এই আচরণের।

নাগপুরে ওই দিন ছাত্রদের সামনে নিবেদিতা আরও বলেছিলেন— 'কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে অনেক যুবক বেরিয়েছেন। কিন্তু এরা শারীরিকভাবে দুর্বল। নিজের জননী এবং ভগ্নীকে রক্ষা করার সাহস বা সামর্থ্য এদের নেই। এই ধরনের যুবক দরকার নেই আমার। আমি চাই একদল অগ্নিগোলকের মতো যুবক। যারা নিজের জননী এবং ভগ্নীকে বিপদের সময় রক্ষা করতে সমর্থ।'

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের বাণীই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্র। পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষ থেকে সূর্য সেন— সকল বিপ্লবী নেতাই স্বীকার করেছেন— ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তেমনই বিপ্লবীরা এও স্বীকার করেছেন— স্বামী বিবেকানন্দের এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দিয়ে নিবেদিতাই তরুণ সমাজকে সংগঠিত করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে মূল হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রমাণ হয় আরও একটি বিষয় থেকে। তা হলো— অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবীরা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হতেন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় পাশাপাশি আরও দুটি গ্রন্থ পাঠ করে— শ্রীমদ্ভগবতগীতা ও আনন্দমঠ।

সত্তর বছরের স্বাধীনতাপর্ব অতিক্রম করে ভারত আজ এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই ভারত স্রেফ পাশ্চাত্যমুখী। এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এই ভারত প্রাচ্যের গৌরব এবং মহিমা আজ বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে ভারতকে দেশের ভিতরে আর একবার সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে হয়েছে। এই সংগ্রাম দেশের ভিতরে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে। এ সংগ্রামে জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। এ লড়াইয়ে ভারতকে স্মরণ করতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতাকে। তাঁদের প্রদর্শিত পথেই জিতে আসতে হবে হিন্দু ভারতকে।

এক বিদেশিনী মহিলার ভারতীয় হয়ে ওঠার কাহিনি

কল্যাণ চক্রবর্তী

ছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল, হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজকের কন্যা, হয়ে গেলেন হিন্দু বিধবা সাধ্বী রমণীর আদরের 'খুকি'। ছিলেন ব্রিটিশ সাজাত্যবোধে অটুট নারী, হয়ে উঠলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের ব্যতিক্রমী অস্মিতা। এ যেন মার্গারেট সত্তাকে একদম ভেঙেচুরে, বিসর্জন দিয়ে হয়ে ওঠা ভারতীয় সন্ন্যাসিনী। স্বামীজী এমন নারীকেই চেয়েছিলেন, 'ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা, সর্বোপরি তোমার ধমনিতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।'

ইংল্যান্ডে স্বামীজীর সঙ্গে যখন তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তখন তিনি আটাশ বছরের পূর্ণ যুবতী আর বিবেকানন্দ তেত্রিশের এক তরুণ সন্ন্যাসী। শিকাগোয় সফল ধর্মাভিযানের পর ধর্মপ্রচারে এসেছেন ইউরোপে। মার্গারেট তখনই ইংল্যান্ডের এক প্রতিষ্ঠিত, সফল ব্যক্তিত্বসম্পন্না জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিদীপ্ত, স্বাধীন চিন্তার অধিকারিণী। কাজেই স্বামীজীর সামীপ্যে-সান্নিধ্যে এসে নিজের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য নিজেকে বদলাতে হয়নি, বদলাতে হয়েছিল কেবল আদর্শকে, নিজের কর্মক্ষেত্রকে। স্বামীজী হয়ে উঠলেন তাঁর 'Master'. তিনি প্রভুর কাছে, বলা ভাল, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে তিনি পরে লিখেছেন, 'Suppose he had not come to London that time ! Life would have been like a headless dream; for always knew that I was waiting for something. I always said that a call would come. And I did.'

আবাল্য ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ সত্ত্বেও চার্চের অধীনে প্রথাগত ধর্মজীবনে সম্পৃক্ত থাকলেও তিনি শান্তির সন্ধান পাননি। অসংখ্য ধর্মপুস্তকে খুঁজেছেন ধর্মজীবনের সঠিক পথ। সেই পথ পেলেন ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায়। অবশেষে স্বামীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে স্বদেশ ও প্রতিষ্ঠিত জীবন ছেড়ে ভারত গঠনের কাজে কলকাতায় এসে পৌঁছালেন। দেখলেন দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরাধীন ভারতবর্ষ আর তারই পশ্চাতে উপলব্ধি করলেন আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যে পূর্ণ ত্যাগ ও তপস্যাময় মহান ভারত। অতুল্য ভারতের বিপ্রতীপে অভুক্ত ভারত। সেই ভারতকে ক্রমশ ভালবাসতে শুরু করলেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষ ও নিবেদিতা মিলেমিশে একাকার হলো। ভারতবর্ষের জন্য আক্ষরিক অর্থেই তিনি নিবেদিত। বিশ্বাস করলেন ভারতের কল্যাণই বিশ্বের কল্যাণ, ভারতের আধ্যাত্মিকতাই জগতের পরম পথ, ভারতবর্ষের সেবা মানেই সমগ্র মানবজাতির সেবা।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" নিবেদিতার মধ্যে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বের বল ছিল, যাকে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন 'যোদ্ধৃত্ব' রূপে। নিবেদিতার এই তপঃশক্তিকে জানলে স্বামীজীর ভারতস্বপ্নকে জানা সম্ভব। যে ভারতবোধ, জাতীয়তাবোধকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন তা তিনি ভারতীয় হিসাবেই করেছেন, বিদেশিনী হিসাবে নয়। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাই যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, "এক বিদেশিনী মহিলার এই ভারতীয় হইয়া যাইবার কাহিনি সভ্যতার ইতিহাসে এক রহস্যময় ঘটনা।" বিখ্যাত বিবেকানন্দ গবেষক শঙ্করী প্রসাদ বসু দেখিয়েছেন ভারতের সংকটকালে আধ্যাত্মিকতা ও স্বদেশসেবার মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি বিপ্লবের মহাদেবী কালীকে স্বামীজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এটিকেই বলা যায়, খ্রিস্ট্রীয় সংস্কারের উপরে কালীর

কৃষ্ণছায়াপাত—এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচক।

তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও ভারতপ্রেম যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিল তার সবচাইতে বড় প্রমাণ অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' ছবিটি। নিবেদিতার 'Kali the Mother' গ্রন্থ পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ভারতমাতার রূপদান করেছিলেন। ভারতবাসীকে তিনি যদি নিজের রক্ত, নিজের ভাই বলে মনে না করতেন, এভাবে ভারতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন না। ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন সাধনে তাঁর আত্মনিয়োগ জাতীয়তাবোধের অন্যরূপ। ধর্মসাধনা, শিক্ষা, সেবা, বিজ্ঞান, শিল্প, ভারতীয়ত্ব, হিন্দুত্ব, স্বাধীনতা আন্দোলন সবধারায় তিনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিলেন, ফলে আলাদা করে তা থেকে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে ছেঁকে তোলাই যায় না।

এক ঝলকে ভগিনী নিবেদিতার জীবন :

১৮৬৭— ২৮ অক্টোবর : উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন শহরে জন্ম। পূর্বনাম : মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। পিতা : স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল (ধর্মযাজক), মাতা : মেরি ইসাবেল, পিতামহ : জন নোবল (ধর্মযাজক)।

১৮৭৭—দশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু, অভিভাবকের দায়িত্বে মাতামহ : হ্যামিলনট (আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা)।

১৮৮৪—১৭ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কেসউইকে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ।

১৮৮৬—রেস্কহ্যাম শহরে 'সেন্ট মার্কস চার্চ'-এ যোগদান।

১৮৮৮—আগস্ট থেকে অক্টোবর : 'North Wales Guardian' থেকে 'Papers on Women's Right' বিষয়ক ছ'টি রচনা প্রকাশ।

১৮৯০—স্কুল শিক্ষকের কাজ নিয়ে লন্ডনের কাছে উইম্বলডনে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু।

১৮৯২—ইংল্যান্ডের উইম্বলডনে 'রাসকিন স্কুল' স্থাপন।

নভেম্বর : মননশীল লেখিকা হিসাবে 'Research' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ।

১৮৯৫—নভেম্বর : ২৮ বছর বয়সে লন্ডনে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ; পিতার ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ, 'একদিন ঈশ্বরের আহ্বান আসবে।

১৮৯৬—দ্বিতীয়বার স্বামীজীর লন্ডন ভ্রমণের সময় সম্পর্ক সুদৃঢ় হলো।

১৮৯৭—জুলাই : স্বামীজীর পত্র পেলেন।

১৮৯৮—২৮ জানুয়ারি : 'মম্বাসা' জাহাজে ভারতবর্ষে পৌঁছালেন।

২২ ফেব্রুয়ারি : শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি : বেলুড়মঠের সাধারণ জন্মোৎসবে যোগদান।

১১ মার্চ : স্টার থিয়েটারে স্বামীজীর প্রচেষ্টায় বিদ্বজ্জন মহলে পরিচয় ও বক্তৃতা।

১৭ মার্চ : শ্রীমা সারদার দর্শন লাভ, 'day of days'।

২৫ মার্চ : স্বামীজী দীক্ষা দিলেন, যজ্ঞের ছাইয়ে ললাটে টিকা পরালেন, তিনি 'নিবেদিতা' হলেন, 'জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সকাল'।

২ আগস্ট : স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথ যাত্রা।

১৩ নভেম্বর : ১৬ নং বোসপাড়া লেনের বাগবাজার বাসভবনে বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা, উদ্বোধক : শ্রীমা সারদা।

১৮৯৯—১৩ ফেব্রুয়ারি : অ্যালবার্ট হলে কালী সম্পর্কে বক্তৃতা, শ্রীরামকৃষ্ণের কালীপুজো আর ব্রাহ্মদের অদ্বৈত ধর্মচেতনা মেলানোর চেষ্টা। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে বাকযুদ্ধ।

—ব্রাহ্মণদের তার বিদ্যালয়ে চা-পানের আমন্ত্রণ।

—কলকাতায় প্লেগরোগ মহামারী আকার নিলে স্বামীজীর নির্দেশে প্লেগ প্রতিরোধ কমিটি গঠন— নিবেদিতা তার সম্পাদিকা এবং স্বামী সদানন্দ প্রধান কার্যাধ্যক্ষ। বাগবাজার, শ্যামবাজার অঞ্চলে সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ।

২০ জুন : স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে গমন, সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ।

১৯০০—'Kali the Mother' গ্রন্থ প্রকাশ।

১ নভেম্বর : ইংল্যান্ডের শুভঙ্করী শক্তি সম্পর্কে মোহ ছিন্ন, তিক্ততর হলো কণ্ঠস্বর, ভারতের ভরসা ভারতেরই হাতে—ইংল্যান্ডের হাতে নয়।'

১৯০১—১৯ জানুয়ারি : ইংল্যান্ড থেকে চিঠিতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ভণ্ডামি ও দু'মুখোনীতির বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষা প্রয়োগ, 'পৃথিবীর প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা চাই।'

১৯০২—ফেব্রুয়ারি : কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

—২ জুলাই : স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ।

—১১ সেপ্টেম্বর : বক্তৃতা সফর শুরু।

১৯০৩—২৮ জানুয়ারি : 'Lord Curzon is a dreadful Viceroy.' সেপ্টেম্বর : 'The web of Indian Life.'

১৯০৪—জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'-তে ভাষণদান।

—পাটনা সভায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, 'যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে তখন যেন নিদ্রায় মগ্ন থেকো না।'

—বুদ্ধগয়ায় গমন।

—শেষ সপ্তাহে সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে শিলাইদহে গমন।

১৯০৫—জানুয়ারি : 'Aggressive Hinduism' প্রকাশ।

১১ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উপস্থিত, পরে কার্জনের মিথ্যা বক্তব্যের প্রতিবাদ (১৩ ফেব্রুয়ারি)।

—ইংরেজ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন শুরু, কাশী কংগ্রেসে যোগদান।

—৭ আগস্ট : টাউন হলে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত।

—১৬ অক্টোবর : বঙ্গবিভাগ কার্যকর দিবসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবিত মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠায় স্যার তারকনাথ পালিতের সঙ্গে সমর্থন দান।

১৯০৬—শ্রদ্ধেয়া গোপাল মায়ের মৃত্যুকালে সেবাযত্ন।

—প্রবল বন্যা ও ভয়ানক মন্বন্তরে সেবাকাজের জন্য পূর্ববঙ্গে গমন, সঙ্গে সমাজসেবী অশ্বিনীকুমার দত্ত।

—'The Modern Review'-তে লিখলেন, 'Glimpses of Famine and Flood in East Bengal in 1906'।

—ব্রেনফিভারে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড অসুস্থ।

—কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে কল্পিত জাতীয় পতাকা প্রদর্শন (রক্তবর্ণ বস্ত্রের উপরে সোনালি সুতো আঁকা বজ্র, দু'পাশে লেখা বন্দে মাতরম্)।

—ধারাবাহিকভাবে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় লেখা প্রকাশ।

১৯০৭—১১ আগস্ট : পাশ্চাত্য দেশে গমন, উদ্দেশ্য স্বামীজীর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা সংগ্রহ।

১৯০৯—জুলাই : ভারতে প্রত্যাগমন।

—মা মেরীর মৃত্যু।

১৯১০—১ ফেব্রুয়ারি : বিখ্যাত বই 'The Master as I saw Him' প্রকাশ।

—মে-জুন : সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু ও অন্যদের সঙ্গে কেদারবদ্রী ভ্রমণ।

—ডিসেম্বর : অজন্তা গুহাচিত্র দর্শন, সঙ্গে ইংরেজ শিল্পবোদ্ধা শ্রীমতী হেরিংহ্যাম, নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার, জগদীশ বসু দম্পতি, গণেন মহারাজ।

১৯১১—১৬ জানুয়ারি : স্বামীজী শিষ্যা স্যারা বুলের মৃত্যু।

—১১ এপ্রিল : কলকাতায় শ্রীমায়ের দর্শন লাভ।

—৯ অক্টোবর : তাঁর ইচ্ছেতে উইল তৈরি।

—১৩ অক্টোবর : ৪৪ বছর বয়সে দার্জিলিংয়ে জীবনাবসান।

ভারতবাসী নিবেদিতার কাছে কেন ঋণী?

১. ভারতবাসী হিসাবে আমরা তাঁর কাছে জাতীয় শিক্ষাদর্শের ঋণে জড়িয়ে আছি। জাতীয় শিক্ষার সংগ্রামে ও পরিকল্পনা রচনায় যারা সে যুগে অগ্রদূত ছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন নিবেদিতা। প্রকৃত শিক্ষা ব্যতিরেকে যে প্রকৃত ভারতীয় হওয়া সম্ভব নয়, তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। স্ত্রী শিক্ষার উজ্জ্বল ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর স্থাপিত বিদ্যালয় জাতীয় ধারায় নির্মিত প্রথম বিদ্যালয়।

২. নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ইউরোপীয় মিশনারিরাও করেছেন, করেছেন ব্রাহ্ম চিন্তাবিদেরাও। তাঁর নারীশিক্ষার মূলসুরটি বাঁধা ছিল ভারতীয় সুকুমারী নারী-আদর্শের সঙ্গে ইউরোপীয় দৃঢ়তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধন। তাঁর শিক্ষা-উদ্যোগ কেবল কর্তব্যবোধের মধ্যে শেষ হবার নয়; অজ্ঞানের জন্য, নিরক্ষর মানুষজনের জন্য গভীর প্রেম ও অন্তরীণ ব্যাকুলতা ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শনের পরতে পরতে। জ্ঞানদানের মধ্যেই কেবল শিক্ষাকে সীমিত না রেখে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্দরমহলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই বাগবাজারের অখ্যাত এক গলির মধ্যেই তিনি নির্মাণ করে ফেললেন এক অনন্য শিক্ষাতীর্থ। তাঁর ছাত্রীরা তাঁর কাছে হয়ে উঠল 'My Child'। তাদের সঙ্গে পড়া পড়া খেলে, হিন্দু সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে বজায় রেখে চলল এক দেশীয় ঢঙের হৃদয়ের উত্তাপ। বানালেন না তোতাপাখির খাঁচা, গাইলেন না দীর্ঘমেয়াদি বিরাট পরিকল্পনার বিলম্বিত লয়ের শিক্ষা-গান। বরং সামর্থ্যের প্রয়াস ভারত রূপ পাখির নারী-পক্ষকে অপরিসীম আনন্দে জুড়ে দিলেন।

৩. ভারতবর্ষের দুঃখ দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে, এদেশের গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুকে সহ্য করে, ইউরোপের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে হেলায় দূরে সরিয়ে রেখে তিনি ভারতবাসীর সেবা করেছেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতার প্লেগরোগ নিবারণে তাঁর কাজ আজও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের কাজকে তিনি কেবল তদারকিই করেননি, নিজেই ঝাঁটা হাতে রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করতে নেমেছেন, মুমূর্ষু রোগীদের নিজে সেবা করেছেন। বানভাসি, মন্বন্তর-দীর্ণ বরিশালে ছুটে গেছেন সেবাসামগ্রী নিয়ে—হতদরিদ্র মানুষের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে, একাত্ম হতে।

৪. নিবেদিতা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোশহীন সংগ্রামী। স্বদেশি আন্দোলনে কতটা যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'A Nation in making' গ্রন্থে। শুধু যে আন্দোলনের জোয়ারে অবগাহন করেছিলেন তাই নয়, অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করতে স্বদেশি পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্যও মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, ''প্রয়োজন বিশেষে বা স্থলবিশেষে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ তিনি আবশ্যক মনে করতেন।'' বিপ্লবী ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন, তাদের পড়ার জন্য নানান বই দিতেন এবং বিপ্লবী কাজে তাঁর অনুমোদন ছিল।

তথ্যসূত্র :

১. সুদক্ষিণা ২০১৫-২০১৬, জন্ম সার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা, নন্দন মিলন বীথি, হরিণাভি, কলকাতা। ২. ভারতের নিবেদিতা, জুলাই ২০০২ (৫ম প্রকাশ), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা। ৩. স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ১৪০৪ (দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ), ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। ৪. ভারতের নিবেদিতা, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, দেশ, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ : ২৪-৩৩।

(লেখক কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব রিসার্চের অধীনস্থ অধ্যাপক)

(ভগিনী নিবেদিতার সার্ধজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত)

ইসলাম : আরবের মরুভূমি থেকে সবুজ বাংলায়

প্রণব দত্ত মজুমদার

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট মক্কায় পৌত্তলিক কোরেশ বংশে ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। আরবি শব্দ 'ইসলাম'-এর মানে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। আল্লার 'কোরান' ও আল্লার রসুল 'মহম্মদের' কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। 'মুসলমান' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী। আরবি ভাষায় 'কুফর' বলতে বোঝায় অবিশ্বাস করা বা বিরোধিতা করা। তাই যারা আল্লার কোরান ও আল্লার রসুল-কে বিশ্বাস করে না তারাই হলো কুফরকারী 'কাফের'। ইসলামের প্রথম কলেমাটি হলো— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা' অর্থাৎ ''আল্লা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মহম্মদ আল্লার রসুল''— এটা কোনো মুসলমানকে বিশ্বাস এবং মানতেই হবে। একথা যারা বিশ্বাস করবে না, তারা হলো অবিশ্বাসী— কাফের; তাঁদের জন্য অত্যন্ত কঠোর সব নির্দেশ আছে ইসলামে। ইসলাম হলো একেশ্বরবাদী (শুধুই আল্লা আছেন আর কেউ নেই) এবং পৌত্তলিকতাবিরোধী।

মহম্মদ মক্কায় তাঁর এই নতুন উপাসনা পদ্ধতির আরম্ভ করলেন। তখন মক্কায় পৌত্তলিক কোরেশরাই ছিল প্রধান। তাঁরা মহম্মদের এই মজহবের প্রচারে ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন এবং মহম্মদকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করলেন। এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে হজরত মহম্মদ ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন মক্কা ত্যাগ করে তাঁর মায়ের দেশ মদিনায় পালিয়ে যান। একেই 'হিজরত' বলা হয়। এই দিন থেকেই 'হিজরি' সন গণনা আরম্ভ হয়। মহম্মদ তাঁর বাকচাতুর্য ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মদিনা অচিরেই দখল করে ফেললেন এবং বেশ কিছু লোককে দীক্ষিতও করে ফেললেন। ধীরে ধীরে তিনি একটি মজবুত মুসলমান বাহিনী গঠন করে ফেললেন। তিনি মদিনাকে কাফেরমুক্ত করার মনস্থ করলেন। দেখা গেলো এই সময় আল্লার কাছ থেকে যেসব 'আয়াত' (আল্লার প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতো তা সবই কাফেরদের ধ্বংস করার জন্য। এইসব আয়াতগুলি বলে তিনি মুসলমান বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করতেন। ইসলামে দীক্ষিত হতে না চাইলে কাফেরদের হত্যা করা, তাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা, তাদের নারীদের যৌনদাসী করা, ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করা সবই বৈধ ও পবিত্র কাজ বলে স্বীকৃত হলো। আর এই কাজকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় 'জিহাদ'। যারা 'জিহাদ' করবে আল্লা তাঁদের জান্নাতে (স্বর্গে) জায়গা দেবেন। সুতরাং নবির নির্দেশে মুসলমান বাহিনী মহাউল্লাসে তরবারির জোরে মদিনায় ইসলামের প্রসার ঘটাতে আরম্ভ করলো। তাঁর মুসলমান বাহিনীও বাড়তে লাগলো।

এইভাবে সমস্ত মদিনা, মক্কা ও তার আশেপাশের অঞ্চলকে ভীতসন্ত্রস্ত করে মহম্মদ সেখানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বাংলাদেশের লেখক এম এ খান তাঁর পুস্তক 'জিহাদ'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মহম্মদের মদিনায় অবস্থানকালে শেষ ১০ বছরে প্রায় ৭০-১০০টি সফল বা ব্যর্থ যুদ্ধ হয়েছিল তাঁর নির্দেশে; তার মধ্যে প্রায় ১৭-২৯টি তে নবি নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ('জিহাদ'—এম এ খান, পৃ. ৮৯)।

'কোরানের ৯ : ৫ আয়াত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণের শর্ত দিয়ে নবি নবপ্রতিষ্ঠিত আরবের ইসলামি রাষ্ট্র থেকে মূর্তি-উপাসনা সম্পূর্ণ নির্মূল করেছিলেন'। ('জিহাদ'— এম এ খান, পৃ. ৯৩)

আরব ভূখণ্ডে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত করে নবি হজরত মহম্মদ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন, ৬৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে পরবর্তী খলিফারা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হলেন— কথায় কাজ না হলে তলোয়ারের জোরে। নবির মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা হন নবির শ্বশুর আবু বকর। দ্বিতীয় খলিফা হন নবির অপর এক শ্বশুর ও সহচর ওমর আল-খাত্তাব। খলিফা ওমরের শাসনকালে ৬৩৬ সালে ভারতসীমান্ত আক্রমণ শুরু হয়। প্রায় আট দশক ধরে বারংবার উদ্যোগের ফলে অবশেষে ৭১২ সালে মহম্মদ-বিন-কাসিম সিন্ধু দখল করে। সে সমুদ্রপথে দেবালয় (আজকের করাচি) হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। দেবালয় শহরের হাজার হাজার হিন্দু পুরুষকে হত্যা করা হয়, সমস্ত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়, প্রায় ৩০ হাজার হিন্দু নারীকে ক্রীতদাসী করে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে ১০০১ সালে আসে গজনির সুলতান মামুদ। সেও হাজার হাজার হিন্দু পুরুষকে হত্যা করে, শত শত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে। সুন্দরী রমণীসহ প্রায় ২ লক্ষ ক্রীতদাস নিয়ে যায় গজনিতে। সোমনাথের মন্দিরও ধ্বংস করে মামুদ। সোমনাথের শিবলিঙ্গ ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সেই টুকরো গজনিতে নিয়ে সেখানকার জাম-এ-মসজিদের সিঁড়িতে ব্যবহার করা হয়। সোমনাথের মন্দির লুট করে নিয়ে যায় প্রায় ২০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। গজনির মামুদ সতেরোবার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করে। মহম্মদ বিন কাসিম থেকে গজনির মামুদ পর্যন্ত মুসলমান সুলতানরা ভারতে এসে কাফের নিধন করেছে, ধন সম্পদ নারী লুণ্ঠন করে দেশে ফিরে গেছে।

১১৯২ সালে ভারত আক্রমণ করে হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করে ভারতে 'ইসলাম' শাসনের প্রবর্তন করে মহম্মদ ঘোরি।

তারপর একেরপর এক মুসলমান শাসকদের বংশ— যেমন মামলুক বংশ (কুতুবুদ্দিন আইবকের বংশ), খিলজি বংশ, তুঘলক বংশ, লোদি বংশ ভারতে তাঁদের ইসলামিক শাসনের বুলডোজার চালায়। ১৫২৬ সালে আসে মুঘল বাদশা বাবর। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন। ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত চলে মুঘল বংশ। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজরা ভারতে ব্রিটিশরাজ কায়েম করে। প্রায় দীর্ঘ ৫০০ বছরের উপর ভারতের হিন্দুরা ইসলামি শাসনের অধীনে গ্লানিময় পরাধীনতার জীবন যাপন করেছে, মুসলমানদের 'জিম্মি' (ক্রীতদাস) হয়ে অসম্মানজনক ভাবে কোনোরকমে বেঁচে থেকেছে। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— ''প্রতিনিয়ত বিনাশের আশঙ্কার মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষগণকে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত করিতে হইয়াছে''।

বাংলায় ইসলামের প্রবেশ ১২০৪ সালে। ওই সময় বক্তিয়ার খিলজি গৌড় দখল করে। ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে বাংলায় সুফি পির দরবেশদের আগমন ঘটে। ১৩০৩ সালে তখনকার বাংলার শ্রীহট্টে (সিলেট) আসে তুর্কিস্তানের সুফি হজরত শাহ জালাল। তখন শ্রীহট্টের স্বাধীন রাজা ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ গৌরগোবিন্দ। রক্ষাকবজের মতো শ্রীহট্টকে ঘিরে ছিল সুরমা নদী। শ্রীহট্টে মুসলমান বাহিনী কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছিল না। রাজ্যের ভিতর থেকে সুফি পির শাহ জালাল অন্তর্ঘাত করে সুরমা নদী অতিক্রম করে মুসলমান বাহিনীকে ঢুকতে সাহায্য করে। মুসলমান বাহিনী রাজাকে হত্যা করে শ্রীহট্টে তাদের রাজত্ব কায়েম করলো। এভাবে আরবের মরুভূমির রুক্ষতায় জন্ম নেওয়া 'কঠোর-আপোশহীন-ইসলাম' বাংলার সবুজ নরম ভূমিতে প্রবেশ করে গেল।

মুসলমান নবাবদের তরবারির ভয়ে, সুফি পির দরবেশের চাতুর্যে প্রভাবিত হয়ে, মুসলমান শাসকদের সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে স্বভাব নরম বাঙালিরা দ্রুত ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে থাকলো। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে ১৮৭২ সালে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানের জনসংখ্যা পৌঁছে গেল ৪৭ শতাংশে এবং ১৯৪৬ সালে তা হয়ে যায় ৫৫ শতাংশ। ভারতের পশ্চিমদিক দিয়ে মুসলমানরা ভারতে প্রবেশ করেছিল কিন্তু পশ্চিমের তুলনায় পূর্বে এই বাংলায় মুসলমানের বৃদ্ধি বেশি হয়েছে। কারণ পশ্চিমে ছিল রাজপুতকুলতিলক রাণা প্রতাপ, মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজী, শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহ আর তাঁদের অনুগামী লক্ষ লক্ষ বীর হিন্দু সেনানি যাঁরা অনায়াসে প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু ধর্মকে বলি দেননি।

বাংলায় 'জিহাদি ইসলামের' গোড়াপত্তন হয়ে গেল ইংরেজের হাত ধরে; যা পরবর্তী কলে কংগ্রেস কমিউনিস্টদের তোষণের ফলে শক্তি বৃদ্ধি করে। যেহেতু বাংলায় মুসলমানের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি, ইংরেজ সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের রাজনীতির কারণে ঢাকার নবাব সালিমুল্লাকে প্ররোচিত করে ঢাকায় ১৯০৬ সালে সৃষ্টি করল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগ'। সংখ্যাধিক্যের জোরে ১৯৪৬ সালে বাংলায় প্রাদেশিক সরকার গড়ল মুসলিম লিগ। ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাতেই তখন ছিল মুসলিম লিগের রমরমা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতকে ভাগ করে 'ইসলামিক রাষ্ট্র' পাকিস্তান গঠন করার জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশে মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট তিন দিন ধরে কলকাতায় 'জিহাদ' করে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করে, শত শত হিন্দুদের দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়, বহু হিন্দু রমণীর শ্লীলতাহানি করে। এর পরেও কংগ্রেস মুসলিম লিগের 'পাকিস্তান' দাবি মেনে নিচ্ছে না দেখে মুসলিম লিগ ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে 'জিহাদ' আরম্ভ করে। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে জিহাদিরা হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করল, হাজার হাজার হিন্দুর ঘরবাড়ি, দোকানপাট জ্বালিয়ে দিল, শত শত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করল, হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করলো, ধর্মান্তরিত হতে না চাইলে হত্যা করা হতে থাকল, হাজার হাজার হিন্দু রমণীর ইজ্জত লুণ্ঠন করা হলো, হিন্দু মেয়েদের জোর করে মুসলমানদের বিয়ে করতে বাধ্য করা হলো। এইভাবে নোয়াখালিতে হিন্দুদের নরকের জীবনে পৌঁছে দিয়েছিল মুসলমান জিহাদিরা। অবশেষে ইসলামিক জিহাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় কংগ্রেস। ভারতভাগ হয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। ভারতের পূর্বদিকে বাংলাকে কেটে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান, ভারতের পশ্চিমাংশ কেটে তৈরি হয় পশ্চিম পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান আর একটি স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়ে যায়।

ইসলামের করাল-গ্রাস-গহ্বরে বাংলার প্রায় অর্ধেক চলে গেছে; বাকি অংশের দিকে ইসলাম থাবা বাড়িয়েছে। দুর্বল নির্জীব বাঙালি হিন্দুরা চৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমের বাণীর আড়ালে নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করার বৌদ্ধিক যুক্তি রপ্ত করায় ব্যস্ত। মনে রাখবেন, জ্ঞানের কথা বলে, প্রেমের বাণী শুনিয়ে, নানারকম তত্ত্বের বুলি আউড়ে ইসলামের তরবারির কাছে পার পাওয়া যাবে না। ইসলামের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণেই হিন্দুরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না; এ ব্যাপারে বাঙালি হিন্দুরা সবচেয়ে বেশি আনাড়ি। 'পয়ঃপানম্ভুজঙ্গানং কেবল্ হি বিষবর্ধনং'— অর্থাৎ সাপকে দুধ পান করালে তার কেবল বিষই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই শাস্ত্রীয় প্রবচনটি বাঙালি হিন্দুদের মাথায় রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র : *১। জিহাদ—এম এ খান। ২। ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা— ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। ৩। এক নজরে ইসলাম— ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। ৪। স্বস্তিকা ৩ এপ্রিল, ২০১৭ সংখ্যা।*

সবার জন্য বাড়ি : মাথার ওপর ছাদ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বেশ কিছু যুগোপযোগী প্রকল্পের সূচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দেশের শহর ও গ্রামবাসী দরিদ্র মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধানে একটি বহুমুখী প্রকল্প। এখনও পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন শহরে মোট ২৪ লক্ষ বাড়ি কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়েছে। এরজন্য ১১,৪৫১ কোটি টাকা বাড়ির মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গৃহনির্মাণ এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব এবং 'সবার জন্য গৃহ' প্রকল্পের মিশন ডিরেক্টর অমৃত অভিজাত এ ব্যাপারে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষেই প্রায় তিন লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণের গতি আগেকার জেএনএনইউআরএম প্রকল্পের থেকে অনেক বেশি।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন (জেএনএনইউআরএন) প্রকল্পে ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে মোট ১২.৪ লক্ষ গৃহনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিল তৎকালীন ইউপিএ সরকার। বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৭,৪০০ কোটি টাকা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয়েছিল ৯.২ লক্ষ বাড়ি। অমৃত অভিজাত বলেন, 'বর্তমান সরকার গত দু'বছরেই ২৪ লক্ষ গৃহনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে এবং এর জন্য আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৩৭,২৭০ কোটি টাকা।' বোঝাই যাচ্ছে, গৃহনির্মাণের সংখ্যা এবং বিনিয়োগের দিক থেকে এনডিএ সরকার ইউপিএ সরকারকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে।

প্রতিটি রাজ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের সুবিধা নেবার জন্য এগিয়ে এসেছে। বস্তুত গরিব মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধানে এত বড়ো উদ্যোগ আগে কোনও কেন্দ্রীয় সরকার নেয়নি। তার থেকেও বড়ো কথা আবেদন করা থেকে শুরু করে চেক পাওয়া অবধি প্রতিটি পর্ব যে নিখুঁত পেশাদারিত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে তাও এদেশে বিরল। আবেদনকারী রাজ্যগুলির তালিকায় সবার প্রথমে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। অন্ধ্রের প্রয়োজন ১৩.৭৭ লক্ষ বাড়ি। এখনও পর্যন্ত আবেদন করা হয়েছে ৪.২০ লক্ষ বাড়ির জন্য। তামিলনাড়ুর ৩.৩৪ লক্ষ বাড়ি কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়েছে। গুজরাট ১.৩৮ লক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য প্রস্তাব পেশ করেছে। মধ্যপ্রদেশের ২.৮৬ লক্ষ বাড়ি কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়েছে।

অমৃত অভিজাত বলেন, 'যেসব রাজ্য ভালো কাজ করছে তাদের সাফল্য গৃহনির্মাণের প্রস্তাব-সংখ্যা দিয়ে মাপলে চলবে না। অসংখ্য গরিব মানুষের মধ্যে কার প্রয়োজন সব থেকে বেশি যেটা খুঁজে বের করাও জরুরি।' উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ত্রিপুরার প্রয়োজন প্রায় ৫০,০০০ বাড়ি কিন্তু জমা পড়া প্রস্তাবের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ৪৫,৯৬৮। উত্তরপ্রদেশের ছবিটাও অনেকটা একই রকম। যেখানে এখনও ৭৮,২৮৭টি বাড়ি কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়েছে। যদিও প্রয়োজন প্রায় ১৫ লক্ষ। তুলনায় মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকে কাজের গতি একটু শ্লথ। মহারাষ্ট্রে ১.৩০ লক্ষ প্রস্তাব জমা পড়েছে, কর্ণাটকে ২ লক্ষ বাড়ি কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গরিব মানুষদের পাশাপাশি মধ্যবিত্তদের জন্যেও রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এই প্রকল্পে রয়েছে ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি স্কিম (সিএলএসএস)। যাদের বার্ষিক রোজগার ১২ থেকে ১৮ লক্ষ টাকার মধ্যে তাঁরাও এই প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য আবেদন করতে পারেন। সুবিধা এটাই, গৃহঋণের ওপর প্রদত্ত সুদের মাত্র তিন শতাংশ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হয়। ■

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)—সবার জন্য বাড়ি
রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ভিত্তিক অগ্রগতি

রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	নির্মাণ প্রস্তাবের সংখ্যা	অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান (কোটি টাকায়)			ভৌত পরিসংখ্যান (সংখ্যায়)			
		বিনিয়োগ	কেন্দ্রীয় অনুদান (প্রস্তাবিত)	কেন্দ্রীয় অনুদান (বণ্টিত)	নির্মীয়মাণ গৃহ (প্রস্তাবিত)	কাজ শুরু	কাজ শেষ	গৃহপ্রবেশ সম্পূর্ণ
অন্ধ্রপ্রদেশ	২০৭	২৪,৮৪০.৫৮	৬,৩২৩.০৩	৯৪০.৮৬	৪,২০,৩১৯	১,৬৮,৪২৯	৮,৭৯৮	৪,৮০২
বিহার	১৮০	৩,৯১১.৭২	১,৪৫৩.৫০	৫৬০.৮৬	৮৮,৩১৭	৪৭,৬৬০	২,৬৫৯	২,৫৭৭
ছত্তিশগড়	৬৯	২,৯৭৩.৭৬	৫১৫.০৯	২৫০.৮৬	৩৫,১৭৯	১৬,৫৫৮	১,৯৭০	১,৪০৪
গোয়া	—	১.১২	০.২২	০.২২	১১	১০	১১	১১
গুজরাট	১৭৪	১০,১৩২.৬১	২,২০৫.৮৫	১,১৭৩.১৯	১,৫৪,৩৬০	১,০৭,১৪৬	৩৭,১৩৫	২৯,৩৮০
হরিয়ানা	৫	৩৪৯.৫৩	২২৬.৫৩	১২১.৭১	৪,৪২১	৩,২৭৭	১,০৭০	১,০৬৭
হিমাচল প্রদেশ	৩৬	২২১.৯২	৯৬.৫২	৩৬.৮৩	৪,৮৯৩	১,৪০১	২৫	২৫
জম্মু ও কাশ্মীর	৪৪	২৯২.৭১	১০৪.২৩	১০.৮০	৬,২৫০	৩৬৬	৮৩	৮৩
ঝাড়খন্ড	১৮৪	৩,০৩১.২৫	১,২৬৩.৪৩	৪৪৪.০২	৮১,৬৮১	৪৩,০১৬	৪,২৮৫	৩,১২৯
কর্ণাটক	৮৪২	৯,২৫৭.৬৪	৩,৩৪১.১৩	৬৭৩.১১	২,০৩,০৮২	৮০,৯১৪	২০,৫১২	১৫,৫৭০
কেরল	১০৬	১,০৮৮.০৪	৫১৫.৪৫	১৮৬.৬৮	৩২,৫৩০	১০,৮৮৭	৫৯৫	৫৯৩
মধ্যপ্রদেশ	৩৬৮	১৯,৪৪৮.৬৮	৪,৪০৪.৮৪	১,৪১৬.৫১	২,৮৬,৬২৮	১,০৯,১৭১	৫,৪৫১	৩,৩৫৮
মহারাষ্ট্র	৪৯	১৪,০৩৫.১২	২,০২৩.২২	৬২০.০৫	১,৩১,০৮১	৪৬,৫৬১	১১,৫০৩	১১,৫০৩
ওড়িশা	১১৬	২,৬৬.৬১	৯৭৬.৪৯	৩০২.৫৭	৫৯,৫১৫	১৮,১৬৮	১,৬৪৩	১,৩৬৩
পঞ্জাব	৩২৯	১,২১৫.৩৩	৬০৩.০৯	৭৩.৮৯	৪২,৮৪৫	৬০০	৩৩৬	৩৩৬
রাজস্থান	৬৫	৩,১৯২.৭৫	৭৮৭.৪৬	৩৬১.৩১	৪৪,৬২৭	২৮,২২৩	১২,০১২	৬,৫৮২
তামিলনাড়ু	১,৬৩৪	১১,৯৫৫.৬৮	৫,০৮২.২১	১,৬৪১.৭৪	৩,৩৪,৫১৭	১,৪৬,৯২৮	১৯,৪৫৪	১৭,২৬৪
তেলেঙ্গানা	১৪৬	৫,০০৪.১৭	১,২৫১.৯২	৪৬৯.৬৪	৮৩,০৩৬	৪৩,১৩৪	৮৪৩	৪২১
উত্তর প্রদেশ	২৫৬	৩,২৫৩.১৪	১,৩৩১.৪৭	৩৫৩.৯৯	৭৮,২৮৭	৫,৪৭৪	৪,৯০৩	৪,৭৩৩
উত্তরাখণ্ড	৪১	৫১৭.৭২	২০২.৩৯	৯৬.৮৬	৮,০০৫	৪,২৩৮	১,৩৩৮	১,৩২২
পশ্চিমবঙ্গ	১৫৩	৫,৯০০.৪০	২,১৮০.২৩	৮৮৪.৮৬	১,৪৪,৬৪৪	৫৮.৪৬৫	১১,০৭৭	১১,০৭৭
মোট (রাজ্য)	**৫,০০৪**	**১,২৩,২৯০.৪৭**	**৩৪,৮৮৮.২৮**	**১০,৬২০.৫৫**	**২২,৪৪,২২৮**	**৯,৪০,৬২৬**	**১,৪৫,৭০৩**	**১,১৬,৬০০**
অরুণাচল প্রদেশ	৫	৯৮.১৬	৭৮.৪৪	৫৭.০৩	১,৬০৬	১,৬০৬	১	১
অসম	৪৭	১,২৪৮.৬৯	৫৪৮.৬৭	৮২.৪৫	৩৬,৫৬৫	৬৯	৬৯	৬৯
মণিপুর	২৪	৬৭৯.৬৮	৩৯৬.৭২	৯৭.২৪	২৬,৪৫১	১,২৯৪	৭০	৭০
মেঘালয়	৮	৩৩.০২	১১.৫১	০.৬৮	৭৬৪	৫৮	২৪	২৪
মিজোরাম	৯	২২২.৯৩	১৬৫.২৯	১৭.২০	১০,৫৫২	৭৫৯	১২২	১২২
নাগাল্যান্ড	১৩	৩৩৫.১৩	২২৯.২৭	৮৫.২৯	১৩,৫৬০	১,০৮১	৪৫৮	৩
সিকিম	১	২.০০	০.৬৫	০.০২	৪৩	১	১	১
ত্রিপুরা	২৪	১,২৬৭.৯৮	৭২২.৫২	৩১৮.৪৭	৪৫,৯৬৮	৪০,৮৪৪	৯১৮	৭৬৮
মোট (উ.পূর্বাঞ্চল)	**১৩১**	**৩,৮৮৭.৫৯**	**২,১৫৩.০৭**	**৬৫৮.৩৮**	**১,৩৫,৫০৯**	**৪৫,৭১২**	**১,৬৬৩**	**১,০৫৮**
আন্দামান নিকোবর	৩	৫৩.৯৬	৯.১৪	—	৬০৯	—	—	—
চণ্ডীগড়	—	১.১৭	০.১৯	০.১৯	৯	৯	৮	৮
দা. ও ন. হাভেলি	১	৩৬.৫৭	১৪.৪৭	২.৮৩	৯১৮	১১৫	১০৩	১০৩
দমন এবং দিউ	২	৫.০৫	২.০৮	০.৯৬	১৩৫	১০	৭	৭
দিল্লি	—	৪২.৪২	৬.৯৭	৬.৯৭	৩৮৮	৩৮৮	২৯৪	২৯৪
লাক্ষাদ্বীপ	—	—	—	—	—	—	—	—
পণ্ডিচেরী	৬	১৬২.৯২	৫৮.০১	২৩.৩৮	৩,৮৬৬	১৮	১৭	১৭
মোট (কেন্দ্রশাসিত)	**১২**	**৩০২.০৯**	**৯০.৮৬**	**৩৪.৩৩**	**৫.৯২৫**	**৫৪০**	**৪২৯**	**৪২৯**
সর্বমোট	**৫,১৪৭**	**১,২৭,৪৮০.১৬**	**৩৭,২৭০.৮৪**	**১১,৪৫১.৮৯**	**২৩,৯২,০৬১**	**৯,৯৩,২৭৮**	**১,৫৭,১০৬**	**১,২৭,৩৯৮**

(৩১ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত)   *(সূত্র : মনিটরিং ডিভিশন-এমওএইচইউএ)*

সবার জন্য বাড়ি

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রায় বদল এনেছে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী কেন্দ্র দেশের গ্রামাঞ্চলে মোট ১ কোটি বাড়ি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে ৩৭ লক্ষ বাড়ি এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের আওতায় ২২ লক্ষ বাড়ি এ বছরের গোড়ায় সম্পূর্ণ হয়েছে। সরকারের এই পরিবর্তিত কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বিপুল সাড়া

সালটা ২০১৬। ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের রিপোর্টে সে সময় বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী আবাস

যোজনা প্রকল্পের অধীন ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি স্কিমের সুবিধাগুলি নিয়ে সাধারণ বাঙালিদের কোনও আগ্রহই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের পারফরম্যান্স খুবই খারাপ ছিল তখন। ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সঞ্জীব শর্মা বলেছিলেন, 'এখনও পর্যন্ত (জুন, ২০১৬) প্রধানমন্ত্রী আবাস সোজনার সিএলএসএস স্কিমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র ১৩৭ জন আবেদন করেছেন। অথচ গুজরাট, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে।' পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল তারপর। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,৯০০.৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রের অনুদান ২,১৮০.২৩ কোটি টাকা। ৮৮৪.৮৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ করা হয়েছে। ওই টাকায় ১,৪৪.৬৪৪টি বাড়ি তৈরি করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫৮,৪৬৫টি বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। ১১,০৭৭টি বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ।

গৃহনির্মাণের পরিবর্তিত তালিকা

রাজ্য	পুরনো লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-১৭)	অতিরিক্ত লক্ষ্য	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ	৫৬১১১	১৮৯৪৩	৭৫০৫৪
বিহার	৪,৭৬,৭১৫	১,৬০,৯৪৩	৬,৩৭,৬৫৮
ছত্তিশগড়	১,৭৪,১১৯	৫৮৭৮৪	২,৩২,৯০৩
গুজরাট	৮৪,৯২৪	২৮,৬৭১	১,১৩,৫৯৫
হরিয়ানা	১৯,১০৬	৬,৪৫০	২৫,৫৫৬
ঝাড়খণ্ড	১,৭২,৫৮৮	৫৮২৬৭	২,৩০,৮৫৫
কর্ণাটক	৬৯,৫৭৬	২৩,৪৮৯	৯৩,০৬৫
কেরল	২৪,৩৪১	৮,২১৮	৩২,৫৫৯
মধ্যপ্রদেশ	৩,৩৫,০৩৬	১,১৩,১১১	৪,৪৮,১৪৭
মহারাষ্ট্র	১,৭২,২৬৪	৫৮,১৫৮	২,৩০,৪২২
ওড়িশা	২,৯৬,১২৭	৯৯,৯৭৫	৩,৯৬,১০২
রাজস্থান	১,৮৭,০৯৪	৬৩,১৬৪	২,৫০,২৫৮
তামিলনাড়ু	১,৩১,৮৩১	৪৪,৫০৭	১,৭৬,৩৩৮
তেলেঙ্গানা	৩৮,০৯৭	১২,৮৬২	৫০,৯৫৯
পশ্চিমবঙ্গ	৩,২৬,৩৩৮	১,১০,১৭৪	৪,৩৬,৫১২
হিমাচলপ্রদেশ	৩,৬৪৪	১২৩০	৪,৮৭৪
জম্মু ও কাশ্মীর	১২,৭২৪	৪২৯৬	১৭,০২০
অরুণাচল প্রদেশ	৬,৭৪৫	২২৮০	৯,০২৫
অসম	১,৬৪,২৪৫	৫৫,৪৫০	২,১৯,৬৯৫
মেঘালয়	১২,৭৩২	৪,২৯৮	১৭,০৩০
মিজোরাম	৩৫৯৩	১২১৩	৪৮০৬
নাগাল্যান্ড	৬৮৪০	২৩০৯	৯১৪৯
সিকিম	১৯৫৭	০	১৯৫৭
ত্রিপুরা	১৭,৭৪১	৫,৯৮৯	২৩,৭৩০
আন্দামান ও নিকোবর	১৫৭	৫৩	২১০
দাদরা ও নগর হাভেলি	২২৭	৭৭	৩০৪
দমন ও দিউ	৪০	১৪	৫৪
লাক্ষাদ্বীপ	৫৭	০	৫৭
পণ্ডিচেরী	৩২১	১০৮	৪২৯
মোট	**২৭,৯৫,২৯৯**	**৯,৪৩,০৩৪**	**৩৭,৩৮,৩২৩**

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

অন্ধ্রপ্রদেশ

দেশে সবার থেকে এগিয়ে

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যত আবেদনপত্র জমা পড়েছে তার ৬৯ শতাংশ এসেছে অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে আবার অন্ধ্রপ্রদেশ এগিয়ে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে এনটিআর নগর স্কিমের কথা ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পে অন্ধ্রের ৩৮টি ছোটবড়ো শহরে ১.২০ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হবে। যেসব আবেদনকারীর নাম বিবেচিত হবে তাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ১.৫০ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেবে। সরকারের লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে দু'লক্ষ বাড়ি তৈরি করা। সঠিক গুণমান বজায় রাখার জন্য এই প্রকল্পে কোনওরকম সমঝোতা করা হবে না বলে সরকারের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সরকারি এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আবাস যোজনায় নির্মীয়মাণ বাড়িগুলির বাইরের সাজসজ্জার জন্য ১৮৩০ কোটি টাকা খরচ হবে।

উত্তরপ্রদেশ

২০১৯-এর মধ্যে ১০ লক্ষ বাড়ি

উত্তরপ্রদেশ সরকার ২০১৯-এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে দশ লক্ষ বাড়ি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্প্রতি ৫৮৬ জন আবেদনকারীর হাতে সরকারি অনুমোদনের চিঠি তুলে দিয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে সরকারি অবহেলায় চলচ্ছক্তিহীন লোহিয়া আবাস যোজনা বন্ধ করে দিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় শুধু আগ্রা জেলাতেই ২১৮০টি বাড়ি তৈরি করেছে। নির্বাচিত প্রতিটি আবেদনকারীকে ১.২০ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ আবাস বিকাশ পরিষদ সম্প্রতি অনলাইন আবেদনপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তাতে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পরিষদ লখনউ, কানপুর মিরাট আগ্রা এবং গাজিয়াবাদে ১২০০ ফ্ল্যাট বিতরণ করেছে। এই যোজনায় ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি স্কিমের সুবিধে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যারা

শেখ ইয়াকুব আলি (৬৩)। ওড়িশার ঢেনকানল জেলায় একটি কাঁচা বাড়িতে থাকতেন। পাকা বাড়ি করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অনুদান পেয়ে তিনি এখন পাকা বাড়িতে থাকেন।

জে. সুধাকর পেশায় সূত্রধর। স্ত্রী জয়ন্তী সুধাকর। থাকতেন তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের সমুদ্রের ধারে প্রায় ঝুপড়ির মতো একটি ঘরে। প্রায়ই সে ঘর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভেঙে যেত। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আবেদন করে তিনি বাড়ি করার টাকা পেয়েছেন। এখন সেখানে থাকেন।

সোমা সাহা, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় থাকেন। তাঁর স্বামী একটি বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে চাকরি করেন। বেতন মাসে ১৭,০০০ টাকা। ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি স্কিমের সুবিধা নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঋণ নিয়েছিলেন। ৪ লক্ষ টাকা ঋণে তিনি সুদে ভরতুকি পেয়েছেন ৭৩,৭৪০ টাকা।

রবিকুমার, তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষ। গত দশ বছর ধরে তিনি সপরিবার অন্ধ্রপ্রদেশের কার্নুল জেলায় একটি টালির চালে ছাওয়া দরমার ঘরে বসবাস করছিলেন। ছোট্ট ঘরটিতে পরিবারের সকলের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

কর্ণাটক

নতুন সাত লক্ষ বাড়ি

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে কর্ণাটকে নতুন ৭ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হবে বলে সম্প্রতি সে রাজ্যের সরকার ঘোষণা করেছে। গত চার বছরে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যটিতে ১২.৫ লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রতিটি গৃহহীন পরিবারকে ভরতুকি দেওয়া হবে এবং মহিলারা নিজের নামে অথবা পুরুষদের সঙ্গে যৌথভাবে আবেদন করতে পারবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই আবাস যোজনার উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বস্তি-সহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী গরিব মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধান। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের জন্য কেন্দ্র এই পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্পে ভরতুকির সুবিধা দিচ্ছে। ভরতুকির সর্বনিম্ন সীমা ১ লক্ষ টাকা। সর্বোচ্চ ২.৫ লক্ষ টাকা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সাফল্য দেখে কর্ণাটক সরকার বিপিএল শ্রেণীভুক্ত নাগরিকদের জন্য একটি নতুন প্রকল্প আনছে। যার জন্য ৬৬২ একর জমি অধিগ্রহণও করা হয়েছে। এখানে যেসব বাড়ি তৈরি হবে সেগুলি ৩০০ স্কোয়ার ফুট মাপের হবে বলে জানা গেছে। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যে গুণমান বজায় রাখা হচ্ছে তা রাজ্যের নির্মাণের তুলনায় অনেক ভালো।

কারা আবেদন করতে পারেন

- অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণী : যাদের বার্ষিক আয় তিন লক্ষ বা তার থেকে কম।
- নিম্নবিত্ত : যাদের বার্ষিক আয় ৩ থেকে ৬ লক্ষ টাকার মধ্যে।
- মধ্যবিত্ত ১ : যাদের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকার নীচে। এই শ্রেণীভুক্ত আবেদনকারী ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন।
- মধ্যবিত্ত ২ : যাদের বার্ষিক আয় ১৮ লক্ষ টাকার কম। এই শ্রেণীভুক্ত আবেদনকারী ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন।
- সংখ্যালঘু শ্রেণী : তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মানুষ এই শ্রেণীভুক্ত। যথোপযুক্ত প্রমাণ-সহ তাদের আবেদন করতে হবে।
- মহিলারা : উপরের যে-কোনও শ্রেণীভুক্ত মহিলারা স্বনামে অথবা পুরুষের সঙ্গে যৌথভাবে আবেদন করতে পারেন।
- বয়ঃসীমা : সর্বোচ্চ ৭০ বছর। শহরে বসবাসকারী প্রবীণ নাগরিকদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাটের বিশেষ সুবিধা।

নিজস্ব বাড়ি পেলেন

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় টাকা পেয়ে তিনি বড়ো বাড়ি করেছেন। পরিবারের সবাই এখন খুব বেশি।

মিসারুন্নেসা, একজন গৃহবধূ। তার স্বামী কেরলের কান্নুর জেলায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী। বিপিএল শ্রেণীভুক্ত পরিবারটি ভাড়া বাড়িতে বাস করত। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় টাকা পেয়ে নতুন বাড়ি বানানো হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে পরিবারটি কেন্দ্রের এই প্রকল্পে খুশি।

আশা শ্রীধর, একটি বেসরকারি

প্রতিষ্ঠানে ওয়েল্ডারের চাকরি করেন। বেতন মাসে ১২,০০০ টাকা। এই সেদিনও তিনি সপরিবারে চেন্নাইয়ের সমুদ্র-তীরবর্তী নইনাকুপ্পাম বস্তিতে থাকতেন।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্যে নিজেদের বাড়ি তৈরি করেছেন।

এই সময়

মৎস্যকন্যা

রাস্তার গর্তে বৃষ্টির জল। বর্ষায় দেশজুড়ে এর জন্য যে কত দুর্ঘটনা ঘটে তার ইয়ত্তা নেই।

সম্প্রতি দক্ষিণের শিল্পী বাদল ননজুনদাস্বামী বেঙ্গালুরুর এমনই এক খানাখন্দে ভরা রাস্তা ভরিয়ে দিলেন ছবিতে। কখনও সেখানে ফুটে উঠল মৎস্যকন্যা কখনও আবার নানান পৌরাণিক চরিত্রের মুখ।

পুলিশকাকু

চার মাসের বাচ্চাটির নাম ফয়জান খান। তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। উদ্ধার

করেছেন হায়দরাবাদের নামপল্লী থানার ইন্সপেক্টর আর. সঞ্জয়কুমার। সম্প্রতি ফয়জানের সঙ্গে নিজের একটা ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন তিনি। তাকে অভিনন্দিত করেছে সারা দেশ।

মেয়ের জন্য

ওয়ার্ল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফি হোক বা বাগান করা কিংবা ব্যালেনাচ --- ন'মাসের ছোট্ট জো তার অনেক কিছুই করে ফেলেছে।

অবশ্যই তার বাবা শোলোম বার সলোমনের সৌজন্যে। মেয়েকে খুশি রাখার জন্য বাবা বাড়িতেই জঙ্গল বানিয়ে ফেলেন। তারপর বুকে হেঁটে পৌঁছে যান সিংহের গুহায়।

সমাবেশ -সমাচার

বহরমপুরে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের অভ্যাসবর্গ

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখা জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের প্রাদেশিক অভ্যাসবর্গ অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬-২৭ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের কাশিমবাজারস্থিত লাধুরাম তোষনিওয়াল সরস্বতী শিশুমন্দিরে। অভ্যাসবর্গে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,

সিধু-কানু-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বর্গে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সত্যনারায়ণ মজুমদার। শ্রীকাপুর সংগঠনের কার্যপদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করেন শ্রীমজুমদার। বর্গে ৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বর্গ পরিচালনা করেন জাতীয়বাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬নং বিধান সরণী কলকাতা-৬-তে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত, সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, প্রান্ত প্রচারক (দ:ব:) বিদ্যুৎ মুখার্জী, স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য প্রমুখ। সভায় বিগত ২০১৬-১৭ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। সভায় মোট ৩৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী শশাঙ্ক

এই সময়

গৃহপালিত সিংহ

প্যারিসে এক ব্যক্তি দিনের পর দিন একটি রোগা এবং দুর্বল সিংহ-শাবকের সঙ্গে ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করছিলেন। সম্প্রতি

পুলিশ তাকে নোজি-লা-সেক শহর থেকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গেছে, শাবকটিকে ভালো করে খেতে দেওয়া হতো না এবং সেলফি তোলার জন্য ধরে আনা হয়েছিল।

টুইটার বয়কট

বিশেষ করে মহিলারা এবং তাঁদের সঙ্গী কিছু পুরুষও চব্বিশ ঘণ্টার জন্য টুইটার বয়কটের ডাক দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, মার্কিন

অভিনেতা রোজ ম্যাকগোয়ানের অ্যাকাউন্ট অন্যায় ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি নানা কেলেঙ্কারির নায়ক হারভে উইনস্টেনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন তাই এই সিদ্ধান্ত।

পোষ্যপ্রেম

পোষা কুকুরের শরীর খারাপ। ইতালির এক মহিলা তাই কর্মস্থল থেকে সবেতন ছুটি চেয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ রাজি হননি।

রীতিমতো আইনি লড়াই লড়ে মহিলা তার দাবি আদায় করে ছেড়েছেন। তিনি ছুটি পাবেন এবং তাঁর বেতন কাটা যাবে না।

সমাবেশ -সমাচার

শেখর দে-র পরিচালনায় আগামী ২০১৭-১৮ সালের কর্মসমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নতুন কর্মসমিতি গঠন করা হয়। সভাপতি : অজয় নন্দী, সহ-সভাপতি : তপন কুমার নাগ, জীবন্ময় বসু, সম্পাদক : তপন গাঙ্গুলী, সহ-সম্পাদক : বিশ্বনাথ নন্দী। সদস্য : অদ্বৈত চরণ দত্ত, বিদ্যুৎ মুখার্জী, তরুণ পণ্ডিত, শক্তি শেখর দাস, বিজয় আঢ্য, প্রণয় রায়। সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী।

বেদান্ত মঠে স্বামী অভেদানন্দের সার্ধশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপার্ষদ তথা রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একবছর ধরে নানা কর্মসূচি পালন করেছে মঠ কর্তৃপক্ষ। তারই অঙ্গ হিসেবে গত ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর মঠ প্রাঙ্গণে এক ধর্মসভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিন স্বামী অভেদানন্দের

প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রবীণ সন্ন্যাসীবৃন্দ। বিশেষ পুজো ও ভক্তদের প্রসাদ বিতরণও করা হয় যথোচিত মর্যাদা সহকারে।

মঠ-মিশনের শতাধিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আসেন নানা প্রান্ত থেকে। ১৫ সেপ্টেম্বর স্বামী আত্মবোধানন্দ অভেদানন্দ মহারাজের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের ব্যাপারে বিশেষ পথনির্দেশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠের সম্পাদক স্বামী দিব্যানন্দ। বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমীর কুমার বসু ও শঙ্কর ঘোষ।

গত ২ অক্টোবর মিনার্ভা থিয়েটার হলে স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও কর্ম অবলম্বনে এক মনোজ্ঞ নাটক উপস্থাপন করে উত্তর হাওড়া নাট্যাঙ্গন থিয়েটার গোষ্ঠী। দেশে ও বিদেশে তাঁর সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড ও প্রভাবের এক চলমান জলছবি যেন নাটকটি। এই নাটকে স্বামী অভেদানন্দের চরিত্রে রূপদান করেন ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। নাট্যকার প্রফুল্ল বসু ও নাট্য নির্দেশক আশু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক পরিশ্রম করে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। সবশেষে ৮ অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দের জন্মের সার্ধশতবার্ষিকী উদযাপনের যবনিকান্ত হয় মঠের নিজস্ব অডিটোরিয়ামে। সেদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্র পাঠ করেন স্বামী কেশবানন্দ। সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কাননবিহারী গোস্বামী। এদিন জাগরণমুখী এক শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন অমিত রায় ও বিশ্বরূপ রুদ্র। সবশেষে তথ্যচিত্র 'যুগপুরুষ অভেদানন্দ' প্রদর্শিত হয়।

এই সময়

জে এন ইউ-তে সাপ

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কর্মীদের কোয়ার্টারে পিছন দিকে

একটি গোখরো সাপ দেখা গিয়েছে। পরে সাপটিকে ক্যাম্পাসেও ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা এসে সাপটিকে ধরে নিয়ে যান।

আমদানি-রপ্তানি

সেপ্টেম্বরে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ২৫.৬৭ শতাংশ বেড়েছে। যার পরিমাণ ১,৮৪,

৩৮৭.৩৬ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে এই সময়ে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১, ৫১,৯৫০.৭৪ কোটি টাকা। আমদানিও ১৮.০৯ শতাংশ বেড়েছে বলে জানা গেছে।

বিদেশি হিন্দু

তাঁর নাম পার ক্রনবর্গ গ্রিভসেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ডেনমার্কের নাগরিক এই মানুষটি

সম্প্রতি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। বারাণসীতে আচার্য বাগীশ শাস্ত্রী তাঁকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করার পদ্ধতি জানার পর তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সমাবেশ -সমাচার

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সেবা কাজ

গত জুলাই ১০১৭ (দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ) ভয়াবহ বন্যায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি পক্ষ থেকে বন্যাকবলিত দুর্গত মানুষের জন্য চাল, ডাল, চিড়ে, গুড়, মুড়ি, বিস্কুট, ওষুধ, ব্লিচিং পাউডার, পানীয় জল এবং রান্নাকরা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সেবা কাজে স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা ত্রাণ সামগ্রী বন্যা পীড়িতদের মধ্যে বিতরণ করেন। ত্রাণ কাজে বেশ কিছু ডাক্তারও অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সকলকে সমিতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

বালুরঘাটে জেলা সমাহর্তার নিকট শিক্ষক সংগঠনের দাবিসনদ পেশ

গত ১৮ সেপ্টেম্বর অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ ভারতের সবগুলি জেলাতে একসঙ্গে জেলা সমাহর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর

নিকট শিক্ষা ও শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে দাবিসনদ পেশের কার্যসূচি গ্রহণ করে। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অনুমোদিত শিক্ষক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ মহাসঙ্ঘের এই কার্যসূচি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জেলা সমাহর্তার নিকট ডেপুটেশনের মাধ্যমে পালন করে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক সহদেব সাহা বলেন, দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ শুধুমাত্র শিক্ষাবিদদের নিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে একটি শিক্ষানিয়ামক সংস্থা গঠন এবং সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে জিডিপি-র ১০ শতাংশ ও রাজ্য বাজেটের ৩০ শতাংশ শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দকরণ।

বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক বিশ্বরঞ্জন সরকার বলেন, দেশের রাজ্যগুলিতে সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হয়েছে অথচ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা ন্যায্য পাওনা থেকে শুধু বঞ্চিতই হচ্ছি না অধিকারের দাবিতে লড়াই করতে গিয়ে ক্রমাগত দুর্বাক্য শুনিছি যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

অতিথি কলম

এম থাম্বিদুরাই

লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করার কথা ভাবা দরকার

আমাদের দেশের নির্বাচনে প্রার্থীর ঘোষিত খরচা ও সেই প্রার্থীর তরফে সরকারি খরচা দু'টির মিলিত অঙ্ক বিপুল। শেষ সাধারণ নির্বাচন অর্থাৎ ২০১৪ সালে খরচ হয়েছিল মোটামুটি ৩৫০০ কোটি টাকা। এই খরচ আবার গুণিতকে বাড়তে থাকে যখন বিভিন্ন সময়ে রাজ্যগুলির ভোট অনুষ্ঠিত হয় আর এই খরচের কথা ভাবলে সত্যিই ভয় হয়। কিন্তু যদি লোকসভা, বিধানসভা থেকে পঞ্চায়েত অবধি নির্বাচনকে ৫ বছর মেয়াদে একই সঙ্গে করানো যায় তাতে যে টাকা বাঁচবে তা দিয়ে এই গরিব দেশের মানুষের অনেক মঙ্গল করা যেতে পারে।

আর এই নির্বাচন কিন্তু দেশে বৃদ্ধি ও উন্নয়নের কাজেও বাধা সৃষ্টি করে। ভোটের সময় একবার নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেলে, সকলেই জানেন ক্ষমতাসীন শাসক দল এমন কোনও প্রকল্প বা কাজে হাতে দিতে পারে না যাতে করে মনে হতে পারে সেটি জনতার মন জয় করে ভোট জোগাড়ের উদ্দেশ্যেই করা হলো। কোনও ভরতুকি, নতুন প্রকল্প বা নির্মাণ পরিকল্পনা কিছুর কথাই ঘোষণা করা যায় না। শুধু তাই নয়, নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার আগেই যে সমস্ত প্রকল্প ঘোষিত হয়েছিল কিন্তু কাজ শুরু করা যায়নি সেগুলিও বন্ধ রাখা নিয়মের মধ্যে পড়ে।

এই নিত্যদিন নির্বাচন সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে কমিয়ে আনার বিষয়ে কোনও সমাধান অবশ্যই বার করতে হবে যাতে উপর্যুপরি নির্বাচন পরিচালনা করে করে ক্লান্ত সরকারি নির্বাচন আয়োগ ও মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। একথা সকলেই জানেন যে সেই ভাগ্যক্রমে ১৯৫২-এর প্রথম নির্বাচন থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন সারাদেশে যৌথভাবে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম ছেদ পড়ে ১৯৬৯ সালে। সেই সময় লোকসভা নির্ধারিত মেয়াদের আগেই ভেঙে যায়। আর এই ৬৭ থেকে ৬৯ এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বারবার রাজ্যে রাজ্যে ৩৫৬ ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ রাজ্য সরকারগুলির সুস্থিতি ও মেয়াদ পূরণকে ব্যাহত করে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে তৎকালীন কমিশন প্রধান ন্যায়াধীশ জীবন রেড্ডি দেশে আবার একই সঙ্গে নির্বাচন করার প্রস্তাব রাখেন। ওই একই বছরে বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীও একই প্রস্তাব দেন যার সঙ্গে তিনি আইন প্রণেতাদের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থাকার কথাও বলেন। ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। দেশের মানব সম্পদ, জনঅভিযোগ, আইন ও বিচার ব্যবস্থার হাল হকিকত দেখার জন্য যে স্ট্যান্ডিং কমিটি রয়েছে তাঁর কংগ্রেসি চেয়ারম্যান ইএম নাদাইয়ালন তাঁর ২০১৫ সালে দেওয়া ৭৯তম রিপোর্টে দীর্ঘকালীন সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা জারি রাখার ক্ষেত্রে লোকসভা বিধানসভার এককালীন নির্বাচনের কথা বলেছেন। এআইএডিএমকে এই প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন করেছিল। এর পরই এপ্রিল ২০১৭-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসার ওপর জোর দেন। আমি ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে অর্থাৎ একই সঙ্গে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। তাই কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে তার সম্পর্কে বিশদে প্রস্তাবনা দেওয়াও আমার দায়িত্ব। এই সূত্রে যেমন মুদ্রাস্ফীতি বা জিডিপির ক্ষেত্রে একটা বেস (Base) সংখ্যা বা মান ধরা হয় তেমনি এক্ষেত্রে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের মার্চকে ধরতে হবে। এই ভাবে আমরা নির্বাচনী ক্যালেন্ডার তৈরি করব। যেমনটা মার্কিনদেশে হয়।

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে দশটি রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। যদি একসঙ্গে নির্বাচন হওয়ার বিষয়ে কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত

> প্রস্তাবিত সংশোধনী আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু কিছু সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে কিন্তু তার সমাধান বার করা অসম্ভব নয়। সেগুলি মেটাতে রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষদের নিয়ে আলোচনাই রাস্তা বাতলে দেবে। অবশ্যই সদিচ্ছার এখানে বড় ভূমিকা রয়েছে।

অনুমোদিত হয় সেক্ষেত্রে এই দশটি বিধানসভার মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই লোকসভার অনুমোদন পাওয়ার পর। আর তা নাহলে এক বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যেতে পারে যতক্ষণ না ২০১৯ সালের একইসঙ্গে নির্বাচন হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ৫টি রাজ্যে ২০১৯ সালের কোনও একটা সময় নির্বাচন হওয়ার কথা। আরও পাঁচটি রাজ্যে ২০১৯ থেকে এক বছরের মধ্যেই নির্বাচন নির্ধারিত আছে। এই দু'টি ক্ষেত্রেই অর্থাৎ ১০টি রাজ্যে নির্বাচন এগিয়ে আনা যেতে পারে যাতে তারা ২০১৯-এর যৌথ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। প্রসঙ্গত (Proviso to section 14 & 15 Representation of Peoples Act 1951) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন আইনগুলির মেয়াদ শেষ হবার ছ'মাস আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন এগিয়ে আনতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদের ৬ মাস আগেই আবার ভোট হতে কোনও বাধা নেই। যদি এই প্রস্তাব অনুমোদন করানো যায় সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি ১৯ থেকে মার্চ ২০১৯ এর প্রথমদিকে ২০টি রাজ্যে লোকসভার সঙ্গেই বিধানসভার নির্বাচন হয়ে যেতে পারে। এই সূত্রে বলা দরকার যদি আমরা এই পদ্ধতিতে নির্বাচনে যাই সেক্ষেত্রে বাকি রাজ্যগুলি যেখানে নির্বাচন ২০১৯-এর পরে অনুষ্ঠিতব্য সে রাজ্যগুলির বিধানসভার মেয়াদকে কমিয়ে আনতে হবে। সেইটুকু সময়ের জন্য যাতে তারা ২০২৪ সালে একইসঙ্গে সব রাজ্য ও লোকসভার নির্বাচনে শরিক হতে পারে। এই রাজ্যগুলি যেহেতু নির্বাচিত ৫ বছরের মেয়াদ পুর্তির সুযোগ পাবে না বরং মেয়াদ কিছুটা কমাতে হবে, তাই সেক্ষেত্রেও লোকসভার অনুমোদন লাগবে।

এখানে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এই প্রক্রিয়া চলাকালীন লোকসভা বা কোনও বিধানসভা মেয়াদের আগেই ভেঙে যায় তখন কী হবে? এক্ষেত্রে লোকসভা বা নির্দিষ্ট বিধানসভার নির্বাচন কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হবে অর্থাৎ যত সময় মেয়াদ পুর্তির জন্য বাকি ছিল সেটুকুর জন্যই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন— ৫ বছরের জন্য নয়। আমরা তো দেখেছি যখন কোনও বিধানসভা বা লোকসভার উপনির্বাচন হয় তখন উভয় সভার সাধারণ নির্বাচন হতে যতটা সময় বাকি থাকে তাঁরা ততটা সময়ের জন্যই নির্বাচিত হন। ঠিক একই ভাবে এই আলোচিত সম্মিলিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব গৃহীত হলে ও তা রূপায়িত হওয়াকালীন সময়ে যদি লোকসভা বা কোনো রাজ্য বিধানসভা ভঙ্গ করতে হয় সেক্ষেত্রেও লোকসভা ও বিধানসভার (যেগুলি ভেঙে গেছে) পুনর্নির্বাচন কেবলমাত্র অবশিষ্ট সময়টুকুর জন্য হবে যেমন সাংসদ বা বিধায়কদের ক্ষেত্রে হয়। এর ফলে আমরা যে প্রস্তাবিত নির্বাচনী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলেছি তাতে কোনো হেরফের হবে না।

এছাড়া, আমাদের আইন প্রণেতারা সাংবিধানিক সংশোধনী এনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন, যেমন জার্মানিতে প্রচলিত রয়েছে যে কোনো অবিশ্বাস প্রস্তাব আনার ক্ষেত্রে বিরোধীদের একটি বিকল্প সরকারের সংখ্যাও হাজির করতে হবে যাতে হঠাৎ করে অন্তর্বর্তী নির্বাচন এড়ানো যায়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারলে ২০২৪ সালের লোকসভা ও সমস্ত বিধানসভার নির্বাচন একইসঙ্গে হতে পারে (কেননা ইতিমধ্যে সমস্ত বিধানসভাগুলিকে এই পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তাদের সঙ্গে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ৫ বছর মেয়াদি যুগ্ম নির্বাচনের বিষয়টিতে রাজি করানো যেতে পারে।)। বিষয়টি সম্ভব হলে এরপর থেকে অর্থাৎ ২০২৪ থেকে আবার ৫ বছর অন্তরই যারা ভারতব্যাপী একবারই মাত্র নির্বাচন হবে।

২০১১ সালে বিলেতের সংসদ, যাকে নাকি সমস্ত সংসদীয় রাজনীতির ধাত্রী বলা হয় সেখানকার আইন প্রণেতারা 'Fixed Terms Parliament Act' লাগু করেছে, যার ফলে নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছরে একটি নির্দিষ্ট দিনেই হবে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও এই প্রথা অনুসরণ করলে দেশের পক্ষে অত্যন্ত শুভ হবে। অর্থাৎ আমাদেরও নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। তবে সর্বাগ্রে এই পরিবর্তন সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন করার মতো ক্ষেত্র আমাদের প্রস্তুত করা জরুরি যাতে এর ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দেওয়া কোনো সমস্যার দ্রুত মোকাবিলা করা যায়।

এই প্রস্তাবিত সংশোধনী আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু কিছু সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে কিন্তু তার সমাধান বার করা অসম্ভব নয়। সেগুলি মেটাতে রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষদের নিয়ে আলোচনাই রাস্তা বাতলে দেবে। অবশ্যই সদিচ্ছার এখানে বড় ভূমিকা রয়েছে।

(লেখক লোকসভার উপাধ্যক্ষ)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

চিঠিপত্র

সার্ধজন্মশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা

সারদা কেলেঙ্কারির পর পশ্চিমবঙ্গের এক রাজনৈতিক দলের মোসাহেবেরা যারা তাদের প্রিয় নেত্রীকে সততার পরাকাষ্ঠা হিসেবে দেখিয়ে মা সারদা এবং সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে তুলনা টানতেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই ছোট্ট প্রতিবেদন। শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে সিস্টার নিবেদিতা কীরকম ধারণা পোষণ করতেন তৎকালীন বাগবাজার বোস পাড়া লেনে সিস্টার নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নির্ঝরিণী সরকারের ছোট্ট একটা লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি যেটা প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৪৮ শারদীয় সংখ্যায়। নির্ঝরিণী দেবী লিখেছিলেন— ‘দুর্গাপূজার সময় দেবীকে গৃহে আনলে আমরা যেভাবে অনুষ্ঠান করি, সিস্টারও সেদিন ঠিক সেইভাবে আমাদের বিদ্যালয়ের দুয়ারে মঙ্গলঘট, আমের শাখা, সশীর্ষ ডাব, কলাগাছ প্রভৃতি স্থাপনা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন গোলাপ-মা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের দুয়ারে গাড়ি থেকে নামলেন তখন সিস্টার সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের উপর মাথা রাখলেন। শ্রীশ্রীমা গভীর স্নেহে সিস্টারের মাথার উপর হাত রাখলেন, সিস্টার সে সময় যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।’ এই ছোট্ট উদ্ধৃতির মধ্যে কোন পবিত্র দিকটা ফুটে উঠেছিল ভারতবর্ষে সদ্য আগত একজন বিদেশিনী মহিলার অবয়বে তা স্পষ্ট। এত অল্প সময়ে কীভাবে রপ্ত করেছিলেন ভারতীয় পরম্পরার আচারগত মূল্যবান দিকগুলি ভাবলে অবাক হতে হয়। সিস্টার নিবেদিতার ভারতবর্ষে পদার্পণের পরমুহূর্তে দুটি কাজে নিজের জীবন নিয়োজিত করলেন। প্রথম কলকাতার প্লেগনিবারণে যথাসাধ্য চেষ্টা সাধন এবং ছাত্রীদের নিয়ে কলকাতার বস্তি এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।

দ্বিতীয় মেয়েদের স্বদেশী ভাবনায় শিক্ষাদান। তাঁর মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিতে ভারতীয় ভাবধারা এবং ইতিহাস সচেতনতার কথা নির্ঝরিণী দেবী তাঁর লেখায় সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন— ‘তিনি যখন চিতোর যান রাণী পদ্মিনী যেখানে জহরব্রত উদযাপন করেছিলেন সেই মহাতীর্থ স্থানে নির্জনে একলা বসে দেবী পদ্মিনীর শেষ চিন্তা ধ্যান করতে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন জানতে পারেননি। সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি যা অনুভব করে ছিলেন সেই অনভূতির বিষয় আমাদের বলেছিলেন শান্তি শান্তি শান্তি আ কী সুন্দর। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু মুদ্রিত ও সুন্দর শুভ্র হাত দুটি জোড় করে প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়লেন, কোনও কিছু বলতে পারলেন না। তখন তাঁকে স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোতি দিয়ে গড়া দেবীমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল।’

নিবেদিতা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তাই নিয়ে তাঁর এক অনুগামী জি এন মুখার্জী কর্তৃক স্থাপিত ‘বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউস’-এর ছাত্রদের নিকট একটা মহামূল্যবান ভাষণ দিয়েছিলেন। নিবেদিতা ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন---‘তোমরা সময় পেলেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বাহির হবে। সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁদের আচার ব্যবহার এবং ধর্মবোধের সম্যক জ্ঞান লওয়ার চেষ্টা করবে। তোমরা যেন ভুলে যেও না তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের পথ। তোমাদের উত্তরসূরিরা যেন তোমাদের পথই একই ভাবে অনুসরণ করে চলেন। দেশের যে প্রান্তেই যাও ভারতমাতার মূর্তি যেন হৃদয়ে অমলিন থাকে।’

আজ নিবেদিতার সার্ধশতজন্মবর্ষ পালনে যারা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোঁজে তাদের উদ্দেশে আমার একান্ত অনুরোধ— ভারতবর্ষকে একবার জানার চেষ্টা করুন। যেমন নিবেদিতা তাঁর সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালেই ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন এবং আমাদের ধর্মসংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতি আনুগত্য রাখার অনুরোধ রেখে গেছেন।

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

রাজ্যে অশনি সংকেত

আমাদের রাজ্য রাজনীতিতে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন বললেও তা কম বলা হবে। উপযুক্ত শব্দটা হবে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব শেষ। এ এক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের অর্থাৎ এই রাজ্যবাসীর দিন দুর্যোগের রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাটছে। এই সরকারের শুরুতেই সামান্য এক কার্টুন শেয়ার করার অপরাধে, অম্বিকেশ মহাপাত্রের মতো একজন অধ্যাপককে চূড়ান্ত হেনস্থা করে থানায় বসিয়ে রাখে এবং কেসও করা হয়। তখনই এই সরকার বুঝিয়ে দিয়েছিল, সরকারে থাকা এই দলের মুখ্যমন্ত্রী কী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডকে ছোট করার চেষ্টায় গোয়েন্দা অফিসার দময়ন্তী সেনকে ট্রান্সফার করে, আমাদের রাজ্যের সৎ পুলিশ বাহিনীকেও বোঝানো হলো...তদন্ত করো কিন্তু রেজাল্ট সরকারের মতানুসারে হতে হবে।

এরপরে আরও একটি ধর্ষণ কাণ্ডে— কাটোয়ায় মেয়ের সামনে মায়ের ধর্ষণকে লঘু করার অপচেষ্টায় সিপিএম কর্মীর স্ত্রী আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে ধর্ষণের স্বীকৃতি দান, আমাদের বোঝায় বিরোধীদলের মা বোনকে ধর্ষণ করায় অপরাধ হয় না। পরবর্তী ক্ষেত্রে স্বঘোষিত ‘মাল’ তাপস পালের, ছেলে পাঠিয়ে ধর্ষণের হুমকি স্পষ্ট করে দিয়েছে ধর্ষণ ব্যাপারে এই সরকারের চিন্তাভাবনা।

মালদার কালিয়াচক থানা জ্বালানোয় মুখে কুলুপ আঁটা এই সরকারই আবার কালিয়াগঞ্জ থানার ওসি মহিম অধিকারীরকে (পুলিশফোর্সকে উত্তেজিত মুসলমান সমাজবিরোধীদের হাত থেকে বাঁচাতে শূন্যে

গুলি চালানোর জন্য) বসিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সংখ্যালঘু মুসলমান ভোটার আগে, তারপর পুলিশের জীবন। আর তাই খিদিরপুরে কলেজ নির্বাচনে নিরস্ত্র এস আই তাপসবাবু গুলি খেয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। সর্বত্রই বিরোধীদের মাথা তুলতে না দেওয়া এই সরকার, ধর্ষণের ক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশ্যে ধর্ষিতা নারীর রেট বেঁধে দেয়। ধুলাগড়ে ভয়াবহ জেহাদি কাণ্ডকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করে বিপন্ন করে তোলে ৭০ শতাংশ ভোটারের অস্তিত্ব।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথমদিন থেকে চলে আসা সরস্বতী পূজা বন্ধ করে হাওড়া জেলার তেহট্টের মানুষকে বোঝানো হয়, গণতন্ত্র এখন সংখ্যালঘু ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটারের জন্য সংরক্ষিত। ঐতিহাসিক নলহাটির দুর্গাপূজা বন্ধ হয়, কলকাতায় পূজা বন্ধ হয়। বাঙালির, বাঙালিয়ানার অপর নাম যে দুর্গাপূজা, সেই পূজার বিসর্জনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া এই সরকারের হাত থেকে বাঁচতে আমাদের হাইকোর্টের দরজায় বিচার চাইতে হয়।

এ রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর নামে ফতোয়া দেওয়া ইমাম বরকতি মুখ্যমন্ত্রীর কাছের লোক হয়। এখানে বিরোধিতার অপর নাম কখনও মাওবাদী হয়, কখনওবা হিন্দু সন্ত্রাসী আবার কখনওবা দাঙ্গাবাজ। এখানে বিজেপির জাতীয় নেতা বাগ্গাজীকে এয়ারপোর্টে আটকে ফেরত পাঠানো হয় কিন্তু দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক বিদেশি রোহিঙ্গা মুসলমানদের আহবান করা হয়।

আমাদের রাজ্যে এই সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবতজীর সভার অনুমতি দিতে চাইছে না, কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলমানদের সমর্থনে মুসলমান সংগঠনকে প্রকাশ্যে সভা করতে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের কাছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই আসল।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের দার্জিলিং সফরে যে কাণ্ড আমরা দেখলাম টিভির পর্দায় এবং রাজ্যের মন্ত্রীদের যে কথা আমরা শুনলাম তার পরিণতি ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

প্রকাশ্য রাস্তায় একজন সাধারণ মানুষকেও কেউ যদি ওইভাবে মারে, আমরা তার নিন্দা করি, কারণ আমরা নিজেদের সভ্য বলেই মানি। কিন্তু এদিনে এ রাজ্যের এক মন্ত্রী কলকাতায় বসে বললেন, 'ওনার উস্কানি মূলক কথার জন্যই এই পরিস্থিতি...এর জন্য বিজেপিই দায়ী...।' ভাবা যায় কে বলছেন এই কথা, শিক্ষামন্ত্রী! তিনি বোধহয় ভুলেই গেছেন চোর-পকেটমারকেও কেউ মারতে পারে না সেটা আইনত অবরাধ। আর একজন সর্বভারতীয় দলের রাজ্য সভাপতির মার খাওয়ার ঘটনায়, উনি মারার যৌক্তিকতা খুঁজছেন। এনার এই শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো মানুষ যদি উস্কানিমূলক কথা শুনে তাকে মারেন তখন কি তাও সঠিক কাজ হবে?

আর এক মন্ত্রী বললেন, 'উনি পাহাড়ে গেলেন কেন...?' অর্থাৎ এক্ষেত্রেও মার খাওয়ার যৌক্তিকতা স্থাপন করা হলো। মজার ব্যাপার উনি আবার রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী, ভাবা যায় পর্যটন মন্ত্রীই পর্যটনে যাওয়ার বিরুদ্ধে...? তা আমাদের মাথায় তো এটা আসছে না যে, দার্জিলিং পাকিস্তানে না আফগানিস্তানে? নাকি কাশ্মীরে? যে যাওয়ার আগে ভাবতে হবে? আর যদি দার্জিলিংয়ে এই রকম স্থিতি থাকে তাহলে কেন জানানো হচ্ছে যে দার্জিলিংয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক?

আবার একটা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, কেন একশো তিন দিন ধরে চলা বন্ধের সময় দিলীপ ঘোষ গেলেন না। তাহলে কি দিলীপ ঘোষকে প্রাণে মারার সুবিধা হতো? বললেই হতো 'উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কেন উনি গেলেন'। চমৎকার!

আসলে আমাদের এই রাজ্যে আজ এমন এক স্থিতি যেখানে সরকারের বিরোধিতা করলেই তাকে দমন করা হবে। পুলিশ আজ দলদাস হয়ে পড়েছে তাদের পেটের দায়ে আর প্রাণের দায়ে। কারণ নইলে এস আই তাপসবাবুর মতোই লাঠি হাতে গুলিগোলা চালানো জায়গায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিরশান্তিতে এই পৃথিবী ছাড়তে হবে।

এই রাজ্য ধীরে ধীরে এক অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে, যার হাত থেকে বাঁচতে আমাদের একত্রিত হতেই হবে। কারণ অশনি সংকেত বুঝতে না পারলে বিপদ আমাদের নিশ্চিত।

—রুদ্র প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বাউড়িয়া, হাওড়া।

রাজ্যের হাল

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র সরকারকে স্বৈরাচারী বলছেন। কিন্তু গত ৬ বছরে রাজ্যের হালত কী, গণতন্ত্র এখানে কি আছে? তৃণমূল সুপ্রিমো, বিজেপিকে স্বৈরাচারী বলছেন, এতো মিথ্যাচার, ২০১২ সাল থেকে সব নির্বাচন প্রহসন।

আক্রান্ত সব বিরোধীরা। রাজ্যে সব এলাকায় তৃণমূল মাস্তান বাহিনীর হুমকি— এখানে অন্যদল করা যাবে না। নবান্নের এরকম নির্দেশ আছে। পুলিশ প্রশাসন সিআইডি যেন তৃণমূল দলের শাখা সংগঠন। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, কেন্দ্রের সিবিআই ইডির ভয় দেখাচ্ছে। চিটফান্ড হয়নি? শীর্ষ আদালত, উচ্চ আদালত কী এই চক্রান্তে শামিল? কী বলছেন মমতা ব্যানার্জী।

২১ জুলাই শহিদ দিবসের নামে যে সভা হয়, তার খরচ লক্ষ্য করেছেন। দারুণ খানাপিনা, তার সঙ্গে রঙিন বোতলও ছিল গাড়িতে। রুটের গাড়ি থাকে না, জানেন?

নারদ কাণ্ড তো দেশবাসী চোখে দেখেছেন। চিট ফান্ডের টাকার হদিশ কোথায়? লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতারিত। শতাধিক আত্মঘাতী হয়েছে। তবুও কেমন দাপিয়ে বেড়ায়। রাজ্য জুড়ে মমতা সমেত সব নেতা-নেত্রীর কাট আউট ছবিতে ছয়লাপ। ৩৫৬ ধারা ছাড়া ভোট করা যাবে না রাজ্যের অবস্থা এমন অবস্থায়।

—শোভন মিত্র,
হাওড়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

গোপাষ্টমী : গোরক্ষার এক পবিত্র অনুষ্ঠান

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ছ' বছরে পা দিল গোপাল। বাড়ল চাপও। একদিন গোপাল মা যশোদাকে গিয়ে বলে, মা আমি এখন বড়ো হয়ে গিয়েছি।

তাই নাকি? তা কত বড়ো? এতো— !

হ্যাঁ, এতটাই বড়ো হয়েছি।

মা যশোদা ছেলের কপালে ছোট্ট একটি চুমো দিয়ে বলেন, তা এখন কী করতে হবে?

আমি আর বাছুর নিয়ে গোঠে যাব না।

বেশ তো, যেয়ো না।

না, আমি এবার বড়ো গোরু চরাবো।

ছেলের এ কথায় সায় দিতে পারেন না মা যশোদা। তাই নানা ভাবে বোঝান। বলেন, বড়ো হলেও গোরু চরানোর মতো বয়েস তোমার হয়নি। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো। তারপর তুমি আর তোমার দাদা— দুজনেই যাবে গোরু চরাতে।

গোপাল কিন্তু জিদ ধরে। বলে, অত কথা শুনতে চাই না। আমি গোরুই চরাবো।

ছেলেকে কোনও ভাবেই সামলাতে না পেরে মা যশোদা শেষে বলেন, বেশ, তাহলে বলো গিয়ে তোমার বাবা নন্দ মহারাজকে। তিনি যদি রাজি হন, তাহলে যাবে। আমি বাধা দেব না।

এভাবে মায়ের মত আদায় করে গোপাল যায় বাবার কাছে। নন্দ মহারাজের কোলে উঠে আবদার ধরে বাবা, এবার আমি গোরু চরাবো।

নন্দ মহারাজ প্রথমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। শেষে হার মানেন ছেলের আবদার আর জেদাজেদির কাছে। বাধ্য হয়ে বলেন, কোনও শুভ কাজই যে কোনও দিনে করা যায় না। তার জন্য দিনক্ষণ দেখতে হয়। তাহলে এক কাজ করো, তুমি বরং দৈবজ্ঞকে ডেকে নিয়ে এসো।

বাবার এক কথায় আনন্দে নেচে ওঠে গোপাল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটে দৈবজ্ঞের বাড়ি। দৈবজ্ঞকে বলে আমি এবার গোরু চরাতে যাব। বাবা তাই দিন জেনে নিতে বলেছেন। বলুন আপনি। তবে একটা কথা, বাবাকে বলবেন, আজই হচ্ছে শুভদিন। এরপর এক বছর আর কোনও দিন নেই। বাবাকে একথা বললে আপনাকে প্রচুর দই, ননি, মাখন দেবো।

আর একথা না বললে কিন্তু— ।

দৈবজ্ঞ ভালো করেই জানেন গোপালকে। তার দুরন্তপনার কথা অজানা নেই তাঁর। তাই বলেন, না-না, ননি, মাখনের দরকার নেই। আমি তোমার কথা মতোই সব বলবো। তুমি শুধু— ।

গোপাল হেসে বলে, না-না, তাহলে কিছু করবো না আপনার।

দৈবজ্ঞ পাঁজি পুঁথি নিয়ে হাজির নন্দ মহারাজের সভায়। পাঁজি খুলে বারবার কী যেন দেখেন। খুবই চিন্তিত মনে হয় তাঁকে। দৈবজ্ঞের ভাবনা দেখে নন্দ মহারাজ বলেন, কী হলো? অত ভাবছেন কেন? কোনও সমস্যা!

হ্যাঁ মহারাজ!

কী— কী দেখলেন।

দেখলুম, আজকেই হলো সবচেয়ে ভালো দিন। এরপর এক বছর আর কোনও দিন নেই।

ও, এই কথা। বেশ, তাহলে আজই শুরু হবে আমার গোপালের গোরু চরানোর সূচনা।

দিন ঠিক হয়ে যায়। মা গোঠে যাওয়ার জন্য গোপালকে সাজিয়ে দেন

মনের মতো করে। সবশেষে তাকে পাদুকা পরাতে যেতেই বেঁকে বসে গোপাল। বলে, গোরুদের পায়ে তো পাদুকা নেই। আমিও পাদুকা পরবো না। বাধ্য হয়েই পাদুকা সরিয়ে রাখেন মা যশোদা। শুধু সেদিন নয়, তারপর যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন, গোপাল পাদুকা ব্যবহার করেনি।

সেজেগুজে দাদা বলরাম এবং অন্য সঙ্গীদের নিয়ে গোপাল যায় গোষ্ঠে গোরু চরাতে। দিনটা ছিল কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথি। এরপর থেকে এই তিথির নাম হয় গোপাষ্টমী বা গোষ্ঠাষ্টমী।

কোনও কোনও পুরাণে আছে, মা যশোদাই গিয়েছিলেন শাণ্ডিল্য ঋষির বাড়ি। তিনিই এই শুভ দিনটি ঠিক করে দেন।

গোপালের গোষ্ঠে যাওয়ার এই দিনটিকে স্মরণ করেই সারা ভারতে এদিন হয় গোপূজা। গোরুকে ভালো করে স্নান করিয়ে, কপালে সিঁদুর ও শিংয়ে তেল মাখিয়ে নানা ভাবে সাজানো হয়। গোরুর পুজো করে তাকে খেতে দেওয়া হয় কচি সবুজ ঘাস বা বাঁশের পাতা। 'গোষ্ঠাষ্টম্যাং গবাং পূজাং গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণম্'— গোরুকে খেতে দেওয়ার সময় বলা হয়, 'ওঁ সৌরভেষ্যঃ গর্বহিতাঃ পবিত্রা পুণ্যরাশয়ঃ। প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ।।'

এদিন শুধু যে গোরুকে পুজো করা হয় তা নয়, গোয়ালঘরও বেশ ভালো ভাবে ধুয়ে মুছে একেবারে সাফ করা হয়।

গোপালের গোচারণকে উপলক্ষ্য করে এদিন সারা ভারতেই নতুন জামা কাপড় পরে আনন্দ উৎসব করার রীতি আছে। নাচ গান, গোষ্ঠলীলা পালা অভিনয় ইত্যাদিও করা হয়। এটি একটা সময়ে দিনটি শুধু আহির বা গোপ সম্প্রদায়ের উৎসব ছিল, বর্তমানে সর্বশ্রেণীরই একটা পরম উৎসবের দিন। শুধু ব্রজধাম নয়, সারা দেশেই পালিত হয় দিনটি। গোরুর পূজার সঙ্গে সঙ্গে হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও বিশেষ পূজা অর্চনা। বঙ্গদেশেও একই ভাবে দিনটি পালন করা হয়। যদিও বঙ্গদেশে এটি তেমন একটি সর্বজনীন উৎসব নয়, তাহলেও বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ওই দিনটি পালন করেন অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং ভক্তির সঙ্গে। গোষ্ঠলীলা কীর্তনে মেতে ওঠেন সকলে।

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয়, বাংলার কীর্তন সঙ্গীতের ধারায় গোষ্ঠলীলার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বহু পদকর্তাই গোষ্ঠলীলা নিয়ে অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। রচিত হয়েছে সম্পূর্ণ পালা কীর্তনও।

গোপাষ্টমীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের আরও একটি লীলাকাহিনি। ব্রজমণ্ডলে সেসময় প্রচলিত ছিল ইন্দ্রপুজো। এরজন্য ইন্দ্রের মনে তীব্র অহংভাব দেখা দেয়। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চেয়েও বড়ো মনে করেন তিনি। ইন্দ্রের সেই দর্পনাশ করার জন্য সকলকে ইন্দ্র পুজোর বদলে গোবর্ধন গিরির পুজো করতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতে ব্রজের গোপমণ্ডলী সেবার গিরি গোবর্ধনের পুজো করেন।

ক্রুদ্ধ ইন্দ্র প্রবল বজ্রপাত আর বৃষ্টিতে ব্রজমণ্ডল একবারে ভাসিয়ে দিতে যান। গোকুলের সমস্ত মানুষ এবং গবাদি পশু রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গিরিগোবর্ধনকে তুলে কড়ে আঙুলের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন কার্তিকের শুক্লা প্রতিপদ থেকে সপ্তমী পর্যন্ত। কৃষ্ণের সেই পাহাড়ের তলায় সকলকে নিরাপদ রাখার ক্ষমতা দেখে দর্পনাশ হয় ইন্দ্রের। শুক্লা অষ্টমীর দিন বৃষ্টি বন্ধ করে মার্জনা চান কৃষ্ণের কাছে। এই ঘটনার স্মরণে কার্তিকের শুক্লা অষ্টমী অর্থাৎ গোপাষ্টমীর দিন হয় গিরি গোবর্ধনের পুজো। এইভাবে গোবর্ধন ধারণ এবং সকলকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম হয় গোবিন্দ।

এই দুটি ঘটনার মধ্য দিয়েই গো-সম্পদের সুরক্ষা এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শুধু প্রাচীন ভারত নয়, এখনও গোবংশই ভারতের অন্যতম সম্পদ। ভারতের প্রধান শিল্প যে কৃষি তাও এই গো-নির্ভর। তাই গোরুর সেবা করা যে মানবিক কর্তব্য একথাই গোপাষ্টমীর বিশেষ তাৎপর্য।

পরাশর সংহিতায় বলা হয়েছে 'গোভিন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ' (৫।১০)— গোধনের মতো আর কোনও সম্পদ নেই। বৃষ সম্পর্কেও পরাশরের উক্তি, 'উক্ষণো বেধসা সৃষ্টাঃ শস্যস্যোৎপাদনায় চ' (৫।৪৪)— ব্রহ্মা শস্য উৎপাদনের জন্য বৃষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই গো-সম্পদের পুজো করা অবশ্য কর্তব্য।

গোরু ভারতীয়দের জীবনকে সবদিক থেকে সমৃদ্ধ করে। ভারতীয়রা তাই গোরুকে মাতা জ্ঞানে পুজো করেন। শাস্ত্রে আছে, 'মাতর সর্বভূতানাম্ গাব'— সৃষ্টির সব কিছুর মাতা। গো-দেহে রয়েছে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান। তাই গোরক্ষা এবং তার সেবাশুশ্রূষা নিছক একটি পূজা অনুষ্ঠান নয়। এটি হলো গো-জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোরও একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। আর যে কারণেই গোপাষ্টমী এবং গো-পূজার রয়েছে একটি বিশেষ তাৎপর্য। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

পিয়ার সাইমন দ্য লাপ্লাস : (১৭৪৯-১৮২৭)

পরিচিতি : তিনি ছিলেন ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং পদার্থবিদ। তিনি হলেন আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। তিনিই প্রথম ব্ল্যাক হোল এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পতনের ধারণা পোষণ করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবনগুলির মধ্যে বিশিষ্ট হলো নীহারিকা সংক্রান্ত অনুমান এবং সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ক গবেষণা।

উদ্ধৃতি : ভারতই আমাদেরকে দিয়েছে প্রয়োগকুশল সংখ্যাতত্ত্বের দশটি সাংকেতিক রূপ। যাদের প্রত্যেকেরই আছে নির্দিষ্ট ও মূল্যবান স্থান এবং পূর্ণতা। আজকে হয়তো এটাকে খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে, তাই তার গুরুত্ব আমরা দিতে চাইছি না কিন্তু এটার অবদান অত্যন্ত গভীর এবং অতিমাত্রায় মূল্যবান। সত্যই এটা ছিল গণিতশাস্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এক অক্ষয় কীর্তি। যতই আমরা গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকি, তখন দেখতে পাই যে হিন্দুদের উৎকৃষ্ট সৃজনশীলতা ছিল প্রাচীনকালের আর্কিমিদিস এবং অ্যাপলোনিয়াসের প্রতিভার থেকেও অনেক বেশি উন্নত পর্যায়ের।

উৎস : ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়া—জেম্‌সএইচ.কে.নরটন।

হেনরি ডেভিড থরো : (১৮১৭-১৮৬২)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকার অন্যতম দার্শনিক, সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক এবং অতীন্দ্রিয়বাদী লেখক। তাঁর লেখা 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' পরবর্তী প্রজন্মের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন লিও টলস্টয়, মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিং-য়ের রাজনৈতিক চিন্তা এবং কার্যাবলীকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

উদ্ধৃতি : প্রতিদিন প্রত্যুষে আমি আমার ধীশক্তিকে ভগবৎ গীতার বিস্ময়কর সৃষ্টতত্ত্বের দর্শনের আলোকে সিক্ত করি। এবং তার (গীতার) তুলনায় আমাদের আধুনিক বিশ্বসাহিত্য আমার কাছে অত্যন্ত ক্ষীণ ও তুচ্ছ বলে মনে হয়।

উৎস : দ্য রাইটিংস অব ডেভিড থরো—ওয়ালডেন।

উদ্ধৃতি : যখনই আমি বেদের কোনো অংশ পড়ি, আমার মনে হয় এক অপার্থিব এবং অদৃশ্য আলোকদীপ্তিতে আমি উদ্ভাসিত হয়েছি। বেদের শিক্ষায় কোথাও সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ নাই। এটা যেন সৃষ্টি হয়েছে সকল দেশ, সময় ও জাতির জন্য এবং এটাই যেন মানব জীবনের পরমতত্ত্ব লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যখন আমি এটা পড়ি তখন মনে হয়, আমি যেন চুমকি বসানো কোনো এক বসন্তের অনাবিল আনন্দের রাত্রি যাপন করছি।

উৎস : অ্যানসেন্ট রুটস্ মেনি ব্রান্‌চেস---ডারলেনা এল অরেঞ্জ, গ্যারি ডোলোউইচ্‌ট।

ড. কার্ল সেগান : (১৯০৪-৯৬)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকার অন্যতম জ্যোতি র্পদার্থবিদ, খগোলবিদ এবং সাহিত্যকার। তিনি অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখেছেন। তিনি হলেন 'অন্তরীক্ষে বুদ্ধিমত্তা' অনুসন্ধানের পথিকৃৎ। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'কস্‌মসের' উপর রচিত চলচ্চিত্র দূরদর্শনে বহুবার দেখানো হয়েছে।

উদ্ধৃতি : সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্মে দেখানো হয়েছে যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেরও ক্ষয় ও লয় আছে। তার অসংখ্য বার জন্ম এবং মৃত্যু হয়েছে। এতে বর্ণিত সময় সারণি আধুনিক যুগের মহাজাগতিক সময় সারণির সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। এতে বর্ণিত হয়েছে ব্রহ্মার এক দিন এবং রাত্রি মানুষের ৮.৬৪ বিলিয়ন বৎসরের সমান, যা পৃথিবী বা সূর্যের বয়সের থেকেও অনেকগুণ বেশি এবং 'বিগ্ বা ব্যাং'-এর বয়সের প্রায় অর্ধেক।

উৎস : 'কস্‌মস'—ড. কার্ল সেগান, র‍্যান্ডম হাউস, নিউইয়র্ক।

জর্জ নাথানিয়েল কার্জন : (১৮৫৯-১৯২৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক এবং ব্রিটিশ ভারতের 'ভাইসরয়' হয়েছিলেন ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত। পরে অবশ্য তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আচার্য পদেও নিযুক্ত ছিলেন বহুদিন।

উদ্ধৃতি : ভারত মানব জাতির জন্য রেখে গেছে এমন অমূল্য ধর্মগ্রন্থ এবং দর্শনশাস্ত্র। সমগ্র বিশ্বের অন্য কোনো ভূভাগে তা মেলা ভার।

উৎস : ইন্ডিয়া ইন বন্‌ডেজ : হার রাইট টু ফ্রিডম—জাবেজ.টি. সান্ডারল্যান্ড।

উদ্ধৃতি : যখন ভারতে অনেক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং তারা সমৃদ্ধশালী ছিল তখন কিন্তু ইংল্যান্ডবাসীরা বনেজঙ্গলে বিচরণ করতো। ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশগুলিকে করে রেখেছিল জঙ্গল এবং খান্ডারভূমির মতো।

উৎস : ইন্ডিয়া ইন বন্‌ডেজ : হার রাইট টু ফ্রিডম—জাবেজ. টি.লান্ডারল্যান্ড।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁডুলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমাজের সহমর্মিতা প্রয়োজন

সুতপা বসাক ভড়

স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে দেশে মহিলাদের একটু হলেও পরিবর্তন হয়েছে। তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন এবং কয়েকজন সেই স্বপ্ন দেখায় সফলও হয়েছেন— যদিও আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনো দেরি আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহিলারা ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। তবে একথা মানতে হবে যে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করতে পারছেন না। মহিলাদের পেশা এবং বৃত্তির দুনিয়ায় সংখ্যা এখনও কম। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। সেজন্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীর ক্ষমতায়নের খুবই প্রয়োজন। নারীর মধ্যে সাহস, ক্ষমতা আছে। তাদের কাজে সাহায্য না করুন, কিন্তু তাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। সে জানে তাকে কী করতে হবে। তাকে পৌঁছে যেতে দিন তার লক্ষ্যে।

মহিলাদের সঠিক মূল্যায়ন সমাজ এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। সেজন্য, একদিকে তাদের দেবী হিসেবে পূজা করা হয়, অপরদিকে তাদের অপমান, অপদস্ত করে কিছু পুরুষ আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন। সমাজে এইরকম দু'মুখো চরিত্রের ব্যক্তি প্রচুর আছে, যাদের স্বরূপ জানা কঠিন। মহিলারা সম্মানজনক জায়গা পাবার জন্য অনেক লড়াই করেছেন, মিনতি করেছেন, কেঁদেছেন, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছেন, তা সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়ন এবং মহিলাদের অধিকারের লড়াই আজও চলছে। সত্যি বলতে কী, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বহু মহিলাকেই শুধুমাত্র মহিলা হবার জন্য অনেক অপমান আর অন্যায় সহ্য করতে হয়। পরিবারের মধ্যেও তারা নিজেদের সুরক্ষিত মনে করতে পারেন না। আসলে সমাজে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে যে গভীর অসাম্য আছে, তা মূলত আর্থিক ও সামাজিক। এই সমস্যার সমাধান পরিবার ও সমাজকেই করতে হবে। মহিলাদের মানসিক এবং আত্মিক সম্মান ফিরিয়ে দিতে হবে পুরুষদেরই।

সমাজের বেশিরভাগ পুরুষের দ্বিমুখী মানসিকতার নিদর্শন হলো আজকের দিনেও মহিলাদের নিজেদের প্রাপ্য অধিকারের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। একদিকে সভা-সমাবেশে বড় বড় কথা, অপরদিকে বাড়িতে ঢুকে সব ভুলে সেই মহিলাদেরই চূড়ান্ত অবমাননা করার মানসিকতা সমাজে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। মহিলাদের সম্পত্তি হিসেবে দেখার মানসিকতাও সমাজে অনেকের আছে। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ তো ঘরে ঘরেই হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আদালত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে যে, মহিলাদেরও আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাদের উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার আগে ভাবতে হবে যে, তাঁরা আকাশের চাঁদ-তারা চাইছেন না, তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকারই চাইছেন, যা মূলত তাঁদেরই ছিল— সমাজ যা কেড়ে নিয়ে তাঁদের রিক্ত, অসহায় করে রেখেছে।

মহিলাদের সক্ষম ও সবল বানাবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো সমাজের সংবেদনশীল হওয়া। দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ির সকলের মহিলাদের প্রতি সংবেদনশীলতার শিক্ষা প্রয়োজন, যাতে মেয়েদের এবং ছেলেদের সমান সুযোগ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। কর্মজগৎকেও সংবেদনশীল হতে হবে, যাতে সেখানে মহিলাদেরও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। অনেক পুরুষ আছে, যারা মহিলাদের উচ্চপদাসীন দেখতে অস্বস্তিবোধ করে, তাদের অবহেলার চোখে দেখেন। আসলে, পুরুষদের এই ঠুনকো অহঙ্কারই নারীর অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা।

মহিলা-ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার উজ্জ্বলা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃত্ব প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। মহিলাদের কেবলমাত্র ঘরের কাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকার কোনো যুক্তি নেই। এজন্য পুরুষদের অহঙ্কার ত্যাগ করতে হবে। মহিষাসুরকে মারার জন্য যখন দেবতারা বিফল হয়েছিলেন তখন তাঁরা মাতৃশক্তির কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন। নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে সেই আদিশক্তিকে আরও বলীয়ান করে তুলেছিলেন। তবেই মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে তাঁদের দুর্গতি নাশ করেন। আর আমরা করছি একদিকে মা দুর্গার আরাধনা, অপরদিকে পরিবারের মাতৃশক্তিকে অবহেলা। এ তো দ্বিমুখী মানসিকতা! সেজন্য, এখন ভেবে দেখার সময় হয়েছে। পুরুষদের উন্নাসিকতা ত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। ∎

তাপসী মামলায় কর্ণাটক হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

ধর্মানন্দ দেব

প্রথমেই বলে রাখি কর্ণাটক এমন একটি রাজ্য যেখানে বাংলা ভাষা হচ্ছে দ্বিতীয় অফিসিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ, যদিও মাত্র ০.০৩ শতাংশ লোক বাঙালি। কর্ণাটক রাজ্য যখন গঠন হয় অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর তখন রাজ্যটির নাম ছিল মহীশূর এবং পরে ১৯৭৩ সালে রাজ্যটির নাম হয় কর্ণাটক। রাজ্যটির রাজধানী হচ্ছে বেঙ্গালুরু এবং ওই রাজধানীতেই অবস্থিত কর্ণাটক হাইকোর্ট। বর্তমানে মুখ্য বিচারপতি বাঙালি শুভ্র কমল মুখার্জি। আজ আলোচনা করব ওই কর্ণাটক হাইকোর্টেরই এক ঐতিহাসিক রায় নিয়ে। রায়টি প্রদান করেন বিচারপতি আনন্দ বাইরারেড্ডি। মামলার আবেদনকারী তাপসী দাস একজন বাংলাদেশি হিন্দু। বর্তমানে বয়স হবে অনুমানিক ৩৩ বছর। জন্ম পদ্মা, চন্দনা, গড়াই ও হড়াই নদী দিয়ে ঘেরা বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলায়। দাদুর নাম ছিল বিজয়কৃষ্ণ দাস এবং পিতার নাম আনন্দমোহন দাস। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান দাদু বিজয়কৃষ্ণ দাস। পরে তাদের বাড়ি ভাঙচুর করে লুট পর্যন্ত করা হয়। জেহাদিরা নিজেদের চাহিদামতো প্রায়ই তাদের পরিবার থেকে 'জিজিয়া' (Zaziya) আদায় করত। 'জিজিয়া' হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রে ইসলামি আইন অনুসারে অমুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এক বিশেষ 'কর' (tax)। হাদিসেও এই জিজিয়া সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু পরিমাণ উল্লেখ নেই। এই জিজিয়া কর প্রদান করে তাপসীর পরিবার নিজেদের জান, মান, ইজ্জত ইত্যাদি রক্ষা করে। এটা শুধু তাপসীর পরিবারের ক্ষেত্রে হয়েছে তা নয়, বাংলাদেশ জন্মের আগে থেকেই সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর নানাভাবে নির্যাতন ও হামলা হয়ে আসছে বলে শোনা যায়। আর ক্রমাগত নির্যাতনের ফলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে কমে এসেছে। এই হার দিনের পর দিন আরো কমবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যদি ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাসের পাতা ওলটাই, দেখতে পাব সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর লাগাতার আক্রমণের পিছনে রয়েছে একটিমাত্র কারণ। কারণটি হচ্ছে 'এথনিক ক্লিনজিং', অর্থাৎ বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু-শূন্য একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা। এরা প্রকৃতপক্ষে চায় না বাংলাদেশে একটিও হিন্দু পরিবারের অস্তিত্ব থাকুক। অতি সম্প্রতি (আগস্ট, ২০১৭) মার্কিন বিদেশ দপ্তর ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদন থেকেও জানা যায় বাংলাদেশে হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় বাংলাদেশ প্রশাসন পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারেনি। ওই প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

যাক, আবার ফিরে আসছি আলোচনার মূল বিষয়বস্তু তাপসীর মামলার কথায়। তাপসী নাকি এই ভাবে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হওয়ার মধ্যে দিয়েই ২০০৯ সালে বাংলাদেশের একমাত্র রাজনীতি মুক্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে অনার্স-সহ স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণ করে। ওই বছরেই তাপসীর মা-বাবা তাপসীকে নিয়ে ভিসা সহযোগে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং ২০০৯ সালের ১০ মে পশ্চিমবঙ্গের মৃণ্ময় বিশ্বাসের সঙ্গে তাপসীর বিবাহ হয়। পরে ২০১০ সালে ওই বিবাহ ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে ভারতে রেজিস্ট্রি হয়। স্বামী মৃণ্ময় বিশ্বাস পেশায় সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। থাকেন মহীশূরের কর্ণাটক হাউসিং বোর্ড কলোনিতে। ভিসার মেয়াদ চলে যাওয়ার ভয়ে তাপসী কিছুদিনের জন্য স্বামীর মহীশূরের ঘর থেকে বাংলাদেশে চলে যান। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্টুডেন্টস ভিসা নিয়ে আবার ভারতে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও নেবেন। ওই ভিসার মেয়াদ ছিল ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় বাংলাদেশে 'শাহবাগ আন্দোলন'।

কারণ এদিন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিচারের রায় ঘোষণা করে। শত শত মানুষকে হত্যার দায়ে ৬টি অপরাধের মধ্যে ৫টি অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করে। কিন্তু হত্যা, ধর্ষণ, সর্বোপরি গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ মেনে নিতে পারেননি। তার ফলশ্রুতিতেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শাহবাগে শুরু হয় আন্দোলন। আর সেই আন্দোলন এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিক্ষোভের রূপ নেয়। বাদ যায়নি বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলাও। ওই জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নৃশংসভাবে হত্যা, অপহরণ, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা তখন বেড়ে যায় এবং তারই মধ্যে ২০১৪ সালের ৩ মে তাপসী দাসের পিতা আনন্দমোহন দাসকে বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলায় জেহাদিরা গুপ্তহত্যা করে। ওই এলাকার পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ ছিল যে জেহাদিদের ভয়ে আনন্দ মোহন দাসের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটুকুও তাপসী দাসের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা করতে পারেননি।

এইসব খবর শুনে তাপসী ভয়ে ভারতে থাকা স্বামীর ঘর থেকে বাংলাদেশে আর ফিরে যেতে পারেনি, মনও চায়নি এবং

নিজের হাতে থাকা ভিসাও আর পুনরায় নবীকরণ করা হয়ে উঠেনি। ২০১৪ সালের ৯ অক্টোবর মহীশূরের বিজয়নগর পুলিশ ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করার জন্য ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের ১৪ (১) (ক) এবং (খ) ধারায় তাপসী দাসকে গ্রেপ্তার করে। তখন তাপসী ছিল অন্তঃসত্তা। মহীশূরের বিজয়নগর পুলিশ স্টেশনের মামলা নম্বর ছিল ২৭৯/২০১৪। তাপসীর স্বামী নিরুপায় হয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টে জামিনের জন্য একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। যার নম্বর ৫২৯০১/২০১৪ এবং ওই মামলায় কর্ণাটক হাইকোর্ট তাপসীর জামিন মঞ্জুর করে ২০১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর। ২৫ হাজার টাকার বন্ড এবং দুজন সিকিউরিটি ক্রমে তাপসী জামিনে জেল থেকে মুক্তি পায়। ওই জামিনের আদেশে কর্ণাটক হাইকোর্ট আরও জানায় বিনা অনুমতিতে তাপসী দাস মহীশূর আদালতের অধীনে থাকা এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না এবং তাকে মাসে প্রতি শনিবার বিজয়নগর থানায় সকাল ৮ ঘটিকা থেকে দুপুর ১২ ঘটিকার ভিতরে একবার উপস্থিত থাকতে হবে। তাপসী কারাগার থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং সেখানে ২০১৫ সালে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। পুলিশও মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তদন্ত শেষে নিয়ম অনুসারে তাপসীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা করে। পরে মহীশূর সিটি আদালতে মামলা শুরু হয়। যার মামলা নম্বর সি, সি ৩৫৪১/২০১৪। আবার তাপসী দাস কর্ণাটক হাইকোর্টে ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর একটি ক্রিমিনাল পিটিশন দাখিল করে ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ নম্বর ধারা (saving of inherent powers of High Court) অনুসারে মহীশূর আদালতের মামলাটি খারিজের জন্য (quashment of criminal proceeding)। কেননা ভারতের কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর দু'টি গ্যাজেট নোটিফিকেশন জারি করে বলেছে— '৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বুদ্ধ, পার্সী, এবং শিখ ধর্মালম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যেসব সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন প্রযোজ্য হবে না। মানবিক কারণেই তাদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ছাড়াই।'

তাই তাপসী এখন জোড়া নোটিফিকেশনের উপর ভিত্তি করেই ভারতে থাকতে চায় এবং ভারতের নাগরিকত্ব লাভের অধিকারী হতে চায়। কর্ণাটক হাইকোর্ট ২০১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ছয় পৃষ্ঠার এক রায় ঘোষণা করে মহীশূর আদালতের তাপসী দাসের বিরুদ্ধে থাকা ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের ১৪ (১) (ক) এবং (খ) ধারার মামলাটি খারিজ বলে ঘোষণা করে জোড়া নোটিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে। ওই রায়ে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এইরূপ : As per the said amendment if Bangladeshi who was Hindu facing religious persecution could be localized as an Indian Citizen. By virtue of the said notification the petitioner can now claim the status of Indian Citizenship and hence seeks quashing of the proceedings. কর্ণাটক হাইকোর্ট আরও স্পষ্ট করে বলেছে এইরূপ--- ''.......The proceeding pending against the petitioner in the court of III Additional First Class Civil Judge (Jr. Dn.) and JMFC, Mysore (Crime No. 279/2014) CC No. 504/2015 are hereby quashed.'' অর্থাৎ মহীশূর আদালতে বিজয়নগর পুলিশের দেওয়া মামলা রদ করে দেয় কর্ণাটক হাইকোর্ট। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় কর্ণাটক হাইকোর্ট কীসের উপর ভিত্তি করে নিম্ন আদালতের বিদেশি আইনের মামলাটি রদ করে দিল। তবে চটজলদি উত্তর দিয়ে বলা যায় শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকারের দেওয়া জোড়া নোটিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে।

পরিশেষে বলব, নোটিফিকেশন দু'টি অসম রাজ্য কার্যকর করা হলে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা বন্দি হিন্দুরা মুক্তি পাবেন এবং অসমের বিদেশি ট্রাইব্যুনালে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে আসা হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বুদ্ধ, পার্সী এবং শিখ ধর্মালম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ডি-ভোটার সংক্রান্ত এবং বিদেশি সংক্রান্ত মামলা চলতে পারবে না। কারণ G.S.R.686(E) নম্বরের নোটিফিকেশনে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে- ''.......are hereby granted exemption from the application of provisioins of the Foreigners Act, 1946 and the orders made there under in respect of their stay in India....'' আজ প্রায় নোটিফিকেশন জারি হওয়ার দু' বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু এই নোটিফিকেশন দু'টি অসমে কার্যকর হয়নি। তাই মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কবে হবে? আদৌ হবে কি? ডি-ভোটার, ডিটেনশন ক্যাম্প এবং বিদেশি ট্রাইব্যুনালের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে হলে কেন্দ্র সরকারের দেওয়া দু'টি নোটিফিকেশন অসমে কার্যকর হওয়া চাই। জোড়া নোটিফিকেশনে কোনো অস্পষ্টতা নেই তার প্রমাণ কলকাতা, রাজস্থান, গৌহাটি এবং কর্ণাটক হাইকোর্টের বিভিন্ন নির্দেশ।

কর্ণাটক হাইকোর্টের রায় ঐতিহাসিক, কারণ ওই রায়ে মহীশূরের নিম্ন আদালতের বিদেশি আইনে তাপসী দাসের বিরুদ্ধে থাকা মামলাটিকে পুরোপুরি খারিজ /রদ বলে ঘোষণা করেছে। জোড়া নোটিফিকেশন তাপসীর কাছে শাপে 'বর' হয়ে উঠেছে। তারপরেও কি অসমে দূর হবে না জোড়া নোটিফিকেশন নিয়ে অবিশ্বাসের 'বিষ' এবং সন্দেহের বীজ? জোড়া নোটিফিকেশনের স্পষ্টতা অসম রাজ্যে কবে প্রমাণ হবে, ভগবানই জানেন।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ কমে যাওয়া ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

মানব শরীরের রক্ত তিন ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি— লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা বা প্লেটলেট। প্লেটলেটের পরিমাণ যখন স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা কমে যায়, চিকিৎসা পরিভাষায় তাকে বলে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী রক্তে প্লেটলেট নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে প্রতিটি প্লেটলেটের আয়ু ৫ থেকে ৯ দিন। নয়তো প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের শরীরের প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত প্লেটলেট তৈরি হচ্ছে না। এই প্লেটলেট নষ্ট হওয়া বা তৈরি না হওয়ায় কারণগুলি হলো— রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ কমে যাওয়া, ভাইরাসের সংক্রমণ, লিউকোমিয়া, কেমোথেরাপি, মাত্রা ছাড়া মদ্যপান। এছাড়াও ভিটামিন সি, কে, এ-এর ঘাটতি জনিত কারণে প্লেটলেট কমতে পারে। ক্যান্সার বা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও এর জন্য দায়ী।

উপসর্গ : রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ কমে গিয়ে থ্রম্বো-সাইটোপেনিয়া হওয়ায় অন্যতম প্রধান উপসর্গ হলো, প্রচণ্ড শারীরিক ক্লান্তি, খানিকক্ষণ চলার পর মনে হয় হাঁটা যাচ্ছে না। শোওয়া থেকে উঠে বসলেও ক্লান্তি গ্রাস করে। কোনও জায়গা কেটে গেলে রক্ত বন্ধ হতে চায় না। অবসাদ, বিষণ্ণতা সর্বক্ষণ গ্রাস করে থাকে মনকে। ত্বকে কখনও কখনও র‍্যাশও বের হয়।

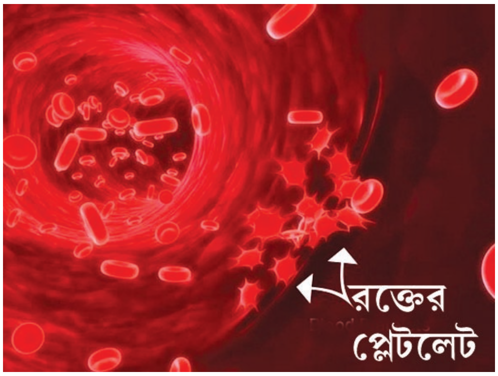

এক্ষেত্রে প্রথমে প্রেসক্রিপশনে রাখতে হবে সিফিলিনাম। এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী ক্যানবিস ইন্টিকা, কারসিথোসিন। বংশে টিবির ইতিহাস থাকলে টিউবার কুলিমাস। র‍্যাশ বেরোলে আস আয়োড। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়াতে একটি ওষুধকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, সেটি হলো সালফোনামাইড। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে হোমিওপ্যাথিতে নির্দিষ্ট রোগের নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নেই। যে-কোনো ওষুধ কারণ ও লক্ষণ মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এবং সবসময় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন, যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রক্ত পরীক্ষা করে রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে ওষুধের পাশাপাশি বেশ কিছু ঘরোয়া পথ্য রয়েছে, যেগুলি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া কমাতে সাহায্য করে।

পেঁপে ও পেঁপে পাতা : মালেশিয়ায় এশিয়ান ইনস্টিটিউট সব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষকদের মতে, পেঁপে ও তার পাতা রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ বাড়ানোর সহায়ক। প্রতিদিন খাবারে পাকা পেঁপে রাখতে পারেন। কিংবা পেঁপের শরবৎ, পেঁপে পাতা বেটে লেবুর রস সহযোগে খেলেও ফল মিলবে।

কুমড়োর বীজ : শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ভিটামিন 'এ' তৈরি করে কুমড়োর বীজ যা প্লেটলেট তৈরিতেও সহায়তা করে।

আমলকী : ভিটামিন সি-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস আমলকী। ভিটামিন সি প্লেটলেট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি এতে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেট। যেসব কারণে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয় সেগুলোকে শরীরের কাছে ঘেঁষতে দেয় না অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

বিট : শরীরে জমতে থাকা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের জন্যও রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ কমে যায়। এই ক্ষত থেকে শরীরকে রক্ষা করে বিট, পাশাপাশি টোটাল প্লেটলেট কাউন্টও বাড়ায়। তাই প্লেটলেট কমে গেলে নিয়মিত এক গ্লাস বিট জ্যুস পান করার অভ্যেস করুন।

অ্যালোভেরার রস : রক্ত থেকে যাবতীয় দূষিত পদার্থ তথা টক্সিন মুক্ত করে। রক্তকে পরিশুদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। রক্তের নানা সংক্রমণকেও দূরে রাখে।

পালংশাক : এতে থাকা ভিটামিন 'কে' কেটে গেলে রক্তপাত বন্ধ করতে সাহায্য করে। পালংশাক প্লেটলেটের পরিমাণ বাড়াতেও সাহায্য করে।

কলকাতা পূর্ব বিভাগের দশদ্রোণ শাখার স্বয়ংসেবক তথা স্বস্তিকার একনিষ্ঠ কর্মী মণ্টু দাসের পিতৃদেব বেলেঘাটা শাখার প্রবীণ

স্বয়ংসেবক কালীনারায়ণ দাস গত ১০ অক্টোবর দশদ্রোণের বাড়িতে সকাল দশটায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি সহধর্মিণী, তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, তিন কন্যা, তিন জামাতা এবং নাতি নাতনি-সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলা সঙ্ঘচালক অশোক ঘোষের পিতৃদেব জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ৩০ সেপ্টেম্বর তারাপুরের বাড়িতে

পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র পরিমল ঘোষ ৯ বছর সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। বাকি ২ পুত্রও স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতার টালিগঞ্জ শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুপ্রিয় রায়চৌধুরী গত ১১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি এক ভাই, দুই বোন, দুই কন্যা, এক জামাতা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সামাজিক সমরসতা প্রমুখ দিলীপ ভকতের বাবা দর্পহারী ভকত গত ৬ অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও ৮ নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্ঘের প্রচারক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগরের দক্ষিণ ভাগের প্রবীণ স্বয়ংসেবক পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী কমলা চট্টোপাধ্যায় স্বল্প রোগভোগের পর গত ২৬ আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্বামী, দুই কন্যা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

হুগলী জেলার খন্যান নিবাসী প্রবীণ স্বয়ংসেবক লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ২৮ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর স্ত্রী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পাণ্ডুয়া প্রখণ্ডের সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করছেন।

* * *

কলকাতা মহানগরের কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ ওমপ্রকাশ রাওতের মাতৃদেবী মায়া

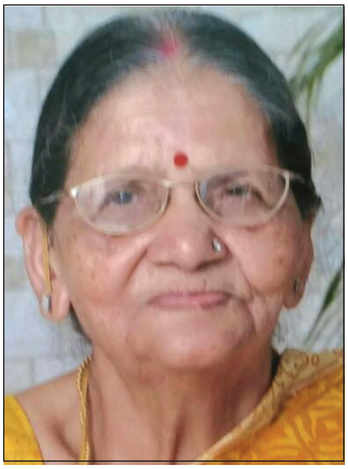

রাওত গত ১১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্বামী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনিকে রেখে গেছেন।

With best compliments from :

A Well Wisher

পাহাড়ি এক গ্রামের গল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এইসব পাহাড়ের অনেক গল্প আছে। যে গল্পের কথকঠাকুর একটি গ্রামের মানুষ। সামান্য একটু টোকা দেওয়ার অপেক্ষা। তাতেই আড়াল থেকে প্রকাশ্যে চলে আসে চার-চারটি যুদ্ধের ভয়ঙ্কর সব গল্প।

গ্রামের নাম হান্ডারমান। কার্গিলের কাছাকাছি। যেসব পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে সেগুলোই বহু চর্চিত এলওসি বা নিয়ন্ত্রণ রেখা। দেশ স্বাধীন হবার পর হান্ডারমান ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১, এই গ্রাম ছিল পাকিস্তানের অংশ। ৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধের পর ভারতের

অংশ হয়ে যায়। এই সময় এখানকার অনেক মানুষ পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। যারা থেকে যান ভারত সরকার তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করে। দেশের নাগরিক হওয়া সম্মানের। অন্তত বুক ঠুকে বলা যায়, 'আমি ভারতীয়। ভারত আমার দেশ।' কিন্তু দুঃখ অত সহজে ঘোচে না। জীবিকার সমস্যা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল প্রতিবেশী গ্রামগুলির বৈষম্যমূলক আচরণ।

ছবিটা বদলাতে শুরু করল ১৯৭৪ সাল থেকে। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে হান্ডারমানের প্রেক্ষাপটটির কথা বলে রাখা দরকার। এখানকার মানুষ আগে যে গ্রামে থাকতেন তার নাম হান্ডারমান ব্রোক। '৭৪ সালে উপত্যকার উত্তরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হলো। হান্ডারমান ব্রোকের বাসিন্দারা দলে-দলে সেখানে গিয়ে নতুন বসত বসালেন। ঘটনাচক্রে সে গ্রামের নামও দেওয়া হলো হান্ডারমান। বাদ গেল শুধু 'ব্রোক' শব্দটি।

দীর্ঘকাল হান্ডারমান ব্রোক গ্রামটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। লোকে বলত ভূতের গ্রাম। শুনশান রাস্তাঘাট, জনমানবহীন বাড়ির উঠোনে ধুলোর পাহাড়, হলুদ পাতার ওড়াওড়ি। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এরকমই ছিল। কিন্তু সেই বছর ইলিয়াস আনসারির মনে হলো এই পরিত্যক্ত গ্রামটির জন্য কিছু করা দরকার। তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন মুজাম্মিল এবং তাফাজুল হোসেন। হাত বাড়িয়ে দিল রুটস কালেক্টিভ নামের একটি স্থানীয় এনজিও। ইলিয়াস আনসারির পৈতৃক ভিটে ছিল হান্ডারমান ব্রোক গ্রামে। তিনি সেই পরিত্যক্ত বাড়িতেই একটি জাদুঘর গড়ে তুললেন।

তাঁর জাদুঘরের সংগ্রহ নেহাত কম নয়। ঔপনিবেশিক যুগে তৈরি (এবং ব্যবহৃত) সুগন্ধী থেকে শুরু করে প্রাচীন পারগি, গয়নাগাটি, ইন্দো-পাক যুদ্ধে ব্যবহৃত বুলেট— সবই এখানে সযত্নে রক্ষিত। ইলিয়াস আনসারির পরিবার এই গ্রামে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করেছেন। তিনিও তাঁর পারিবারিক সংগ্রহ থেকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান সামগ্রী জাদুঘরকে দান করেছেন। জাদুঘরের সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়াস এখনও অব্যাহত। হান্ডারমান ব্রোক গ্রামের প্রাচীন এবং বিস্মৃত দেওয়ালচিত্রগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য বেশকিছু শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই শিল্পী কীর্তি গুপ্তা এবং জাগরুত রাওয়াল ইতিমধ্যে অঙ্কনের কাজ শুরু করেছেন। এছাড়া, যেসব লোকশ্রুতি চর্চার অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে, স্থানীয় প্রবীণদের সাহায্যে চলছে তাদের আবার স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস।

হারিয়ে যাওয়া হান্ডারমান ব্রোক যত ফিরে আসছে ততই বাড়ছে এই অঞ্চলে পর্যটকের সংখ্যা। এখানকার মানুষের জীবিকা-নির্বাহের যে সমস্যা ছিল তার একটা মীমাংসা করা গেছে। জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই তিন হাজার পর্যটক দেখতে এসেছিলেন। উদ্যোক্তারা এখন চাইছেন কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় সেনার অসামান্য সব বীরগাথা নিয়ে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে।

সুতরাং যদি কেউ কার্গিলে যান অবশ্যই ঘুরে আসবেন হান্ডারম্যান ব্রোকে। এখানকার সংগ্রহ আপনার চোখ ভিজিয়ে দেবে। সারাজীবন মনে থেকে যাবে ঘরে ফেরা এক গ্রাম দেখার অভিজ্ঞতা।

কলা ডাকাতি

সুমন্ত দাসের বয়স ষোল কিন্তু চেহারাটা রোগা-পটকা। গায়ে তেমন জোর নেই। সুমন্তর দাদা অনন্ত। সেও হাড় জিরজিরে। যেন বাতাসে উড়ে যায়। অথচ ওদের বংশে এমন রোগা-পটকা কেউ নেই। সবাই বেশ হাট্টাগাট্টা চেহারার। সুমন্তর বাবা বলে— আমার এই দুই ছেলে বংশের মান রাখলো না। আমরা হলাম ডাকাত-জমিদার হারু দাসের বংশধর। ডাকাতি করে জমিদারি বানিয়েছে আমাদের পূর্ব পুরুষরা। তাদের ভয়ে বড় বড় লোকেরা সিটিয়ে থাকতো। আর সেই বংশের ছেলের কিনা এই শরীর! কিন্তু কী করা যায়, দুই ভাইয়ের যে স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতিই হয় না। মা গর্ব করে বলে--- আমার দুই ছেলে পেয়েছে তার মামা বংশের গড়ন।

এবারের দুর্গাপূজাতে সুমন্ত আর অনন্ত মায়ের সঙ্গে মামা বাড়ি গিয়েছিল। পুজো কাটিয়ে লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন ওরা বাড়ি ফিরে এলো। লক্ষ্মীপুজোতে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে থাকতে হয়। মা তাই আর মামাবাড়িতে থাকতে চাইলো না। লক্ষ্মী পুজো মানে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। গ্রামের ছেলেদের সেদিন খুব ফুর্তি। জ্যোৎস্নার আলোয় চলে খেলাধুলো।

সুমন্তদের বাড়ির কাছেই দুর্গা মণ্ডপ। সেখানে আজ রাতে লক্ষ্মী পুজো। সন্ধ্যে হতে সুমন্ত সেখানে হাজির। কবাডি খেলা হবে। কিন্তু গায়ে জোর নেই বলে সুমন্তকে কেউ দলে নেয় না। সুমন্ত শুধু খেলা দেখে। খেলা বেশ জমে উঠেছে। সুমন্ত খেলা দেখছে। পাশের পাড়ার গদাই সুমন্তকে ডাকলো। গদাই সুমন্তর থেকে একটু বড়। গদাই বলল— তুই তো খেলছিস না, তোকে তো কেউ খেলায় নেয় না। চল আমার সঙ্গে।

সুমন্ত বলল— কোথায়?

গদাই বলল— আজ লক্ষ্মীপুজো। জানিস না লক্ষ্মী পুজোতে কী করতে হয়? চুরি করতে হয়। তাহলে পুণ্য হয়।

সুমন্ত দাঁড়িয়ে পড়লো, বলল— আমি জানি লক্ষ্মীপুজোতে অন্যের জিনিস লুকিয়ে রাখতে হয়। তাহলে পুণ্য হয়। চুরি করতে হয় তা তো কখনো শুনিনি। তুই যা, আমি যাবো না।

গদাই বলল— আরে না, চুরি কেন? আমরা করবো ডাকাতি। সামনে কলাবাগানে কলা পেকেছে। এক কাঁদি নামিয়ে নিয়ে আসবো।

সুমন্ত তাতেও রাজি হলো না। বলল— আমি ওসবে নেই।

গদাই এবার বলল— বুঝেছি তুই ভয় পেয়েছিস। তুই এতো ভিতু। এই জন্য তোর বাবা তোকে দেখতে পারে না। তোরা হলি হারু ডাকাত-জমিদারের বংশধর। বীরের জাত। তোর এতো ভয় পেলে চলে।

সুমন্ত বলল— তাই বলে কলা চুরি?

গদাই বলল--- আবার চুরি বলছিস? বললাম না ডাকাতি। আর জ্যোৎস্না রাতেই তোর যা ভয় তাতে কলা ছাড়া আর কী ডাকাতি করবি?

সুমন্ত তাতেও রাজি হয় না।

গদাই বলে--- তোকে এইজন্য কেউ খেলায় নেয় না। কোনো সাহস নেই তোর। সাহস দেখানোর আজ একটা সুযোগ করে দিচ্ছি তোকে, কাজে লাগা। এক কাঁদি কলা নামিয়ে এনে সবাইকে খাওয়া, দেখবি সবাই তোকে খেলায় নেবে। গদাইয়ের মুখে নিজের বংশগৌরবের কথা শুনে সুমন্তর বেশ ভালো লাগছিল। তারপর খেলায় সুযোগ পাওয়ার লোভ। সুমন্ত বলল— ঠিক আছে চল। কিন্তু আমি শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবো। বাকি যা করার তুই করবি।

গদাই বলল— ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুই শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিবি। গদাই আরও দুজন শাগরেদ ডেকে আনলো। চারজন মিলে চললো কলা ডাকাতি করতে। পরের দিন সকালে হইহট্টগোলে সুমন্তর ঘুম ভাঙলো। কাল অনেক রাত পর্যন্ত খেলা চলেছিল। তারপর আবার কলা খাওয়া। সবাই সুমন্তকে বাহবা দিচ্ছিল। বিছানা থেকে নেমে সুমন্ত বাইরে এলো। দেখে বাবা খুব চিৎকার চেঁচামেচি করছে। বলছে— কার এতো সাহস আমার বাগানের কলা চুরি করে। কে এমন বাপের বেটা আমার বাগানে ঢোকে। কার এতবড় বুকের পাটা। আসলে কাল রাতে কলা ডাকাতির সময় সুমন্ত খেয়ালই করেনি গদাই ওকে যে বাগানে নিয়ে গেছিল সেটি আসলে ওদেরই বাগান। সুমন্তর মনে খুব দুঃখ হলো। গায়ে জোর নেই বলে বাবা কত কথা বলে। এবার যদি শোনে সুমন্ত কাল রাতের কলা চুরিতে সঙ্গ দিয়েছে তাহলে আরও এক কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সুমন্ত আর দেরি করলো না। সোজা গদাইয়ের বাড়ি। গদাইকে গিয়ে বলল— তোরা কাল আমাদের বাগানের কলা আমাকে দিয়েই চুরি করালি।

গদাই বলল— তুই মন খারাপ করছিস কেন? এতে তো ভালোই হলো। তোর বাবা তো স্বীকার করলো যারা চুরি করেছে তাদের বুকের পাটা আছে। তার মধ্যে তো তুইও আছিস। আর তাছাড়া আমরা চুরি করিনি, হারু ডাকাত-জমিদারের বংশধর সুমন্ত দাসের নেতৃত্বে আমরা করেছি ডাকাতি।

সুমন্ত মাথা চুলকে বলল— তুই ঠিকই বলেছিস।

ভারতের পথে পথে

অযোধ্যা

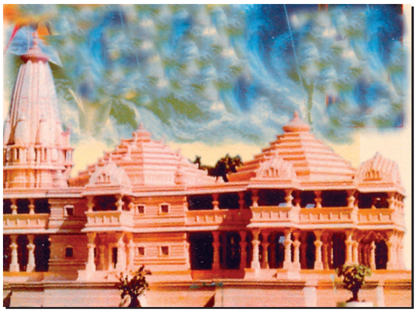

ভারতের একটি প্রাচীন নগরী অযোধ্যা। ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রাচীন কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের ফৈজাবাদ জেলায় অবস্থিত। ভারতের জনমানসে রাজা দশরথের রাজধানী ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত অযোধ্যা। সেজন্য হিন্দুদের কাছে অযোধ্যা একটি তীর্থক্ষেত্র। ইতিহাস অনুযায়ী মুঘল সম্রাট বাবর রামচন্দ্রের জন্মস্থানকে ভেঙে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। সেই সময় থেকেই রামচন্দ্রের জন্মস্থান উদ্ধারের লড়াই চলে আসছে।

বর্তমানে সেখানে অস্থায়ী একটি তাবুতে ভগবান রামলালা পূজিত হন। এখনো কোনো স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

এসো সংস্কৃত শিখি

अहं किमर्थ असत्यं वदामि ?

আমি কেন মিথ্যা বলব?

भवान् अपि एवं वदति किम् ?

তুমিও এরকম বলছ কি?

भवान् एवं कर्तुम् अर्हति किम् ?

তুমি এরকমও করতে পার কি?

भवान् गच्छतु, मम किञ्चित् कार्यम् अस्ति।

তুমি যাও, আমার কিছু কাজ আছে।

वृथा भवान् चिन्तां करोति।

তুমি বৃথা চিন্তা করছো।

ভালো কথা

পূজা পরিক্রমা

আমার বাবা, মা এবং বাবার ছাত্রছাত্রীরা মিলে এবারের পুজোতে পথশিশুদের নিয়ে পূজা পরিক্রমার আয়োজন করেছিল। প্রথমে পুজোর আগে সবাই মিলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে শিশুদের নাম সংগ্রহ করেছে। সেই লিস্ট অনুযায়ী সপ্তমীর দিন সবাইকে ডেকে এনে নতুন জামা দেওয়া হয়। তারপর গাড়ি করে ঠাকুর দেখতে বের হই। আমরা সবাই একসঙ্গে লাইন করে পুজো প্যান্ডেলে ঢুকে ঠাকুর দেখেছি। সব শেষে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সবাই মিলে খুব আনন্দ হয়েছিল ওই দিন। আগামী বছর পুজোর সময় আবার হবে এই পূজা পরিক্রমা।

মেঘদীপ দাস, সপ্তম শ্রেণী, বরানগর, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) নু ন্ধা ন স

(২) ম রা তী ব

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) পু কা রু ষ

(২) ন দা রো য়া

১১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) বিবেকানন্দ (২) ছন্দপতন

১১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) প্রতিযোগিতা (২) গীতগোবিন্দ

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভজিৎ পাল, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা। (২) শঙ্খশুভ্র সামন্ত, ফুলঝোড়, দুর্গাপুর। (৩) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (৪) অরিত্র নন্দ, এগরা, পূর্বমেদিনীপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

বেঙ্গল সামুই
ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

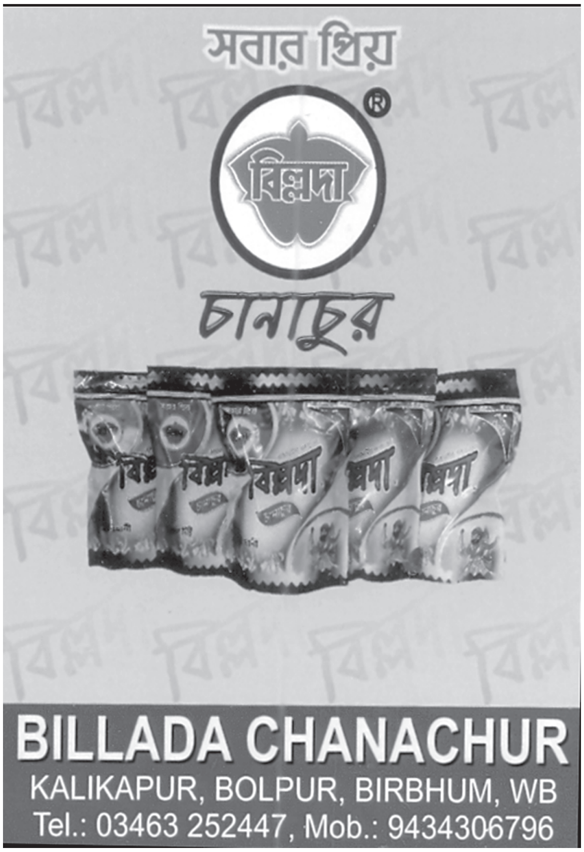

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

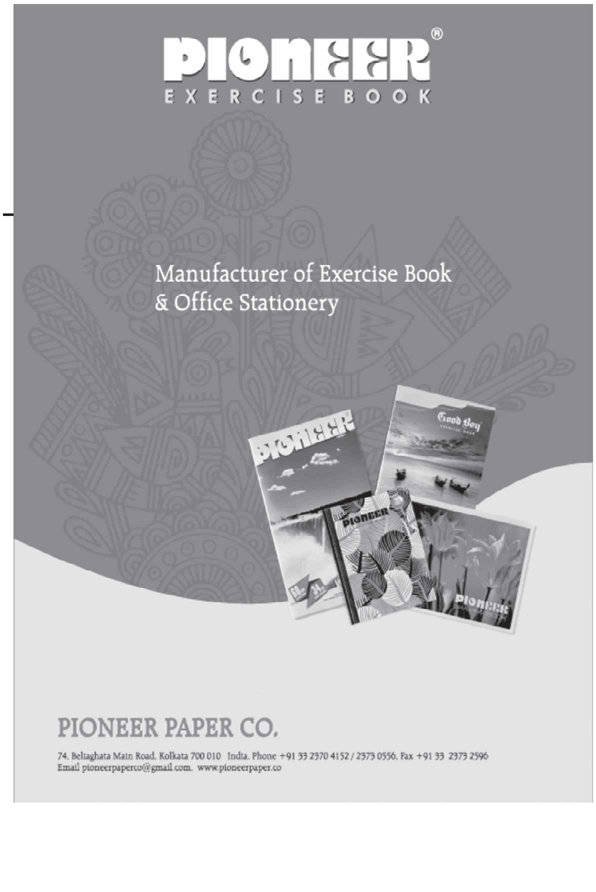

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
23 October - 2017 - Rs. 10.00,

মঞ্জুভাষ প্রকাশিত

প্রশান্ত প্রামাণিক-এর
কপিল থেকে চন্দ্রশেখর
মূল্য : ৬০০ টাকা
পুরাণ কাহিনীর বিজ্ঞানভাষ্য
মূল্য : ১৬০ টাকা

চিত্র মিত্র -র
বেদান্তের আলোয় গীতাঞ্জলি
মূল্য : ৩০০ টাকা

জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক
গুরু বিশ্বাস-এর
স্বপ্নলোকের চাবি
মূল্য : ২৫০ টাকা
পোকা
মূল্য : ২৫০ টাকা
বীজ
মূল্য : ১৭০ টাকা
পণ্যা
মূল্য : ১৫০ টাকা
পরীতলা
মূল্য : ২০০ টাকা
ঝোপড় পট্টি
মূল্য : ২৫০ টাকা

যুথিকা রায়-এর
আজও মনে পড়ে
মূল্য : ১৫০ টাকা

পরিবেশক
প্রিটোনিয়া
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা,
বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে
আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
NR Vandana ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।